

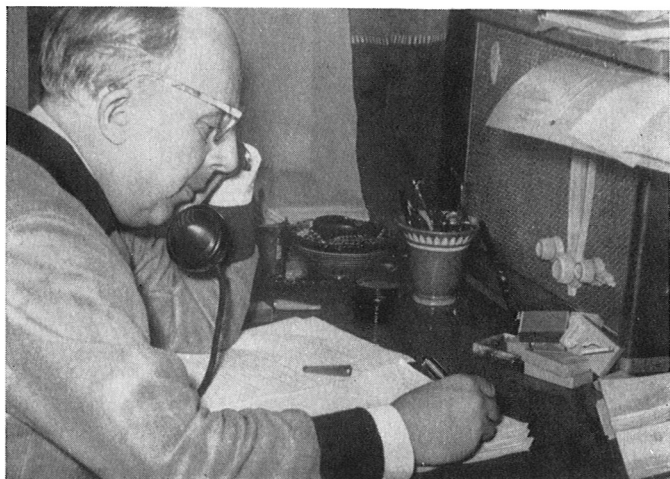


ভাসিলি আর্দামাস্কি
এক'ই বাড়ির লোক

মস্কায় একটি অতি সাধারণ
বাড়ির উঠানে পাড়ার ছেলেরা খেলে
“গৃহযুদ্ধের” খেলা। ক্রমে সে খেলা
থেকে মন সরে যায় অন্য বিষয়ে, বয়স
বাড়ে, ছেলেদের জীবনের পথ আলাদা
হয়ে যায়।

বিশ বছর কেটে গেল।
ব্রীলবাসের স্টপে হঠাৎ দেখা হল
আগেকার “জঙ্গী” দোস্তদের দুজনের,
জানা গেল তাদের হালের কথা।
ওদের একজন, অধুনা সাংবাদিক,
ঠিক করল শৈশবের বন্ধুদের নিয়ে
গল্প লিখবে। কী করে একটির পর
একটি বন্ধুকে সে বের করল তার
বর্ণনা সূত্রে কাহিনী প্রসারিত
হয়েছে পামিরে তুমারাবৃত চূড়া
থেকে সাইবেরীয় সহরে আঞ্চলিক
পার্টি কমিটির দপ্তরে, তখনকার
শান্তিপূর্ণ দূর প্রাচ্য থেকে জার্মানির
পরেকার বন্দিশিবিরে।

ছেলেবেলায় খেলার সাথী
ফেদিয়া পেত্রভ, “তড়বড়ে তানিয়া”,
“পীডটেকটিভ” তলিয়া, বড়দের
আদরে মিশা রমেইকো ও অন্যান্যদের
জীবনে অনেক কিছু আছে যাকে
অপ্রত্যাশিত ভাবা যায় এবং যা
অপ্রত্যাশিত বটেও, কিন্তু গোটা বইতে
লেখকের এই দৃঢ় বিশ্বাস ফুটে
উঠেছে যে শৈশব, শৈশবের বন্ধুত্ব ও
দোস্তি কখনো মরে না। এ সব গভীর
ছাপ ফেলে মানুষের চরিত্রে।



সোভিয়েত ছোট গল্প গ্রন্থমালা

ভাসিলি আর্দাঘাৎস্কি

এক'ই বাড়ির লোক

বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়

মস্কো

অনুবাদ: রেখা চট্টোপাধ্যায়
প্রচ্ছদপট ও মৃদ্রণ পরিকল্পনা: ড. আলেক্সেয়েভ

ВАСИЛИЙ АРДАМАТСКИЙ

МЫ С ОДНОГО ДВОРА

সূচি

তানিয়া . . .	৫
কুড়ি বছর পরে	২৫
অনাথ . . .	৪৭
স্বার্থপর . . .	৭৫
উঁচু পাহাড়ের পাদদেশে	১০৪

তানিয়া

ছেলেবেলার কথা মনে পড়ছে... দিনগুলি কেটেছিল মস্কোর এক সংকীর্ণ উঠনে, তার চারিদিকে উঁচু উঁচু বাড়ি। সেটাকে দেখাত যেন একটা বিরাট পাথরের কুয়ো হঠাৎ শূন্যে গেছে। একদিন আমি সাহস করে ইমার্জেন্স-মই বেয়ে আয়তাকার নীল আকাশের দিকে উঠেছিলাম। সেখান থেকে, কুয়োটার বাইরে থেকে ভেবেছিলাম সবুজ মাঠ দেখতে পাব। কিন্তু চোখে পড়ল শূন্য এলোমেলো বাড়ির ছাদের ভিড়, নীচে ডান দিকে আমাদের পথটা, সেটাকে চিনতে খানিক সময় লেগেছিল ... খানিক পরে এই মই বেয়ে উঠি বলে আফশোস করেছিলাম, নামার সময় ভয়ে গা ছমছম করে উঠেছিল। একটি মেয়ে না থাকলে, মনে হয় নামতে পারতাম না। মেয়েটি বড্ডো সাহসী, কল্পনার বালাই তার একেবারেই ছিল না— কোনো সবুজ মাঠ দেখার আশা সে করেনি। ওপরে ওঠার সময় তার শূন্য একটি মাত্র দৃর্ভাবনা ছিল:

“খাঁকখাঁকে পাহারাউলি মাগীটা আমাদের দেখতে পাবে না তো?” ছাদে উঠেই অতি স্বাভাবিক গলায় সে বলল, “কোথায় তোমার সবুজ মাঠ?” তারপর উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করে সে প্রথম শূন্য করেছিল তাড়াতাড়ি নামতে। আমি নামছিলাম তার পিছন পিছন, মনে হচ্ছিল মই’এর লোহার ধাপগুলো দাঁত দিয়ে চেঁপে ধরি। শেষটায় যখন মাটিতে পৌঁছেছিলাম তখন আমার পা থরথর করে কেঁপেছিল। তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে গিয়েছিলাম। কিন্তু যাবার আগে আমার অবস্থাটা সে লক্ষ্য করেছিল। কয়েক দিনের মধ্যেই আমাদের উঠনের সবাই জেনে গেল যে আমার একধরনের অসুখ আছে — উঁচুতে উঠলে আমি ভয় পাই। মেয়েটির বাবা ছিলেন ডাক্তার। বাড়িতে যেসব অসুখের কথা শুনত সেই অসুখগুলো প্রত্যেকের মধ্যে আবিষ্কার করে সে মজা পেত।

উঠনে ছিল আমার বয়সী বারোটি ছেলে। নিজেদের আমরা বলতাম “চাপায়েভের ডিভিসন”। এই নামটি গৃহযুদ্ধের বীরের নাম। আশেপাশের বাড়ির ছেলেদের বলতাম “ক্যাম্পেলের বাহিনী”। এই নামটা ছিল এক শ্বেত-রক্ষী জেনারেলের। তাই আমাদের পথটায় তখনও চলত গৃহযুদ্ধ ... আমাদের ডিভিসনে ছিল সেই মেয়েটিও, আমার সঙ্গে সেদিন যে ইমার্জেন্সি-মই বেয়ে উঠেছিল। অবশ্য চাপায়েভের দলে যদি কোনো মেয়ে মেশিনগান-চালিয়ে না থাকত তাহলে বোধহয় আমাদের ডিভিসনে সেই মেয়েটিকে নিতাম না। তবু

এ বিষয়ে আমি অতটা জোর করে বলতে পারি না: মেয়েটি ছিল সত্যিই ডার্নিপটে। তার ডাকনাম ছিল “তড়বড়ে তানিয়া”। মারপিটের সময় প্রায়ই সে ছিটকে মাটিতে পড়ত, কিন্তু মদহতের মধ্যে উঠে ধাঁ করে লড়াই’এর মধ্যে ফিরে আসতে দেখেই শত্রুপক্ষ একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যেত। কখনো সে অন্য মেয়েদের সঙ্গে ঘোরাফেরা করত না। তার সম্বন্ধে ছেলেদের ছিল খুব উঁচু ধারণা, এমন কি কয়েকজন তাকে একরকম ভয়ই করত।

তারপর নানা জটিল কারণে আমাদের ডিভিসনটা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়তে শুরুর করে। আমরা “ইয়াং পাইয়োনায়ার দলে” যোগ দেবার সময় সেটা শুরুর হয়, যদিও তখন আমরা তা বুঝতে পারিনি। লাল নেকটাই পরার আর “হ্যালো” বলার বদলে হাত তুলে স্যালুট করার লোভে আমরা যোগ দিই ঐ দলে। আসলে কিন্তু ব্যাপারটা অনেক জটিল ছিল। আমাদের প্রথম পাইয়োনায়ার র্যালির কথা এখনও স্পষ্ট মনে আছে। আমাদের নেতা সেগেই কলস্কভ সেই র্যালিতে নেমস্তন্ন করেছিলেন পাকাচুল এক ভদ্রলোককে। ক্রান্সায়া প্রেস্‌নিয়ায় গ্রামিকদের বিদ্রোহে তিনি যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর গাটওলা হাতের বড় থাবায় মুখ ঢেকে কাশতে কাশতে নানা অদ্ভুত কথা আমাদের তিনি বলেন। আমাদের সবচেয়ে অবাক লেগেছিল কারণ যে ঘটনাগুলোর কথা তিনি বলেন সেগুলো ঘটে যাচ্ছে-পিঠে, রোজ যেসব পথ আর স্কোয়ারে আমরা যাই

সেখানে। জানা গেল যেখানে আমরা থাকি সেখানে ব্যারিকেড তৈরি হয়েছিল, হয়েছিল যুদ্ধ। আর ঠিক সেইখানেই বড়োর বদকে আঘাত লাগে। র্যালি শেষ হলে আমরা গিয়েছিলাম কুদ্রিন্‌স্কায়া স্কেয়ারে। সেখানে ছাই রঙের ছোট ছোট বাড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে বেশ খানিকক্ষণ আমরা চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলাম। বাড়িগুলো অতীত বীরত্বের মৌন সাক্ষী।

‘ভাবো একবার, সবসময় আমি ভেবে এসেছি যুদ্ধ হয়েছে শুধু ঔসারৎসিন আর পেরেকপের কাছে-পিঠে,’ স্তব্ধতা ভঙ্গ করে বলল তলিয়া শেচবার্কভ।

বাড়ি ফিরে হঠাৎ মনে হল আমাদের উঠনটা নেহাত ছোট, আগে আমাদের মনে সে যে যাদু বিস্তার করেছিল সেটা আর নেই।

‘চল, “ক্যাম্পেল দলের” ছোঁড়াগুলোকে পিটিয়ে আসি,’ কলিয়া লাস্কি প্রস্তাব করল।

‘তাদের কথা ভুলে যা,’ ভালিয়া আখিঁপভ বলল উদাস সুরে।

যাই হোক, সেই দিনই আমাদের গৃহযুদ্ধ থেমে গেল না। কিন্তু সেই যুদ্ধটা এখন হয়ে পড়ল নিরুৎসাহ আর একঘেয়ে ধরনের। তাছাড়া দলে বিশ্বাসঘাতকও দেখা দিল।

সর্বপ্রথম সবচেয়ে বিশ্রী বিশ্বাসঘাতকতা করল ফেদিয়া পেত্রভ। সে ছিল আমাদের সেনাপতি। একদিন সে পদত্যাগ

করে আমাদের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলল। তার জায়গাটা যখন আমি নিলাম তখন যুদ্ধ করার মনোবল নেই বললেই হয়।

অল্পক্ষণের মধ্যে তলিয়া শেচবার্কভ “ক্যাম্পেল” উঠনের একটি মেয়ের সঙ্গে গিয়ে হঠাৎ বন্ধুত্ব পাতায়। মেয়েটি তাদের কম্যান্ডারের বোন। তলিয়া শত্রুদের উঠনে যাতায়াত শুরুর করল। একদিন বলে বসল আর সে কখনো যুদ্ধ করবে না। বলল ঐ যুদ্ধটা নাকি অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ ছিল আর কিছু না ... পরের নিদারুণ আঘাতটা এল “তড়বড়ে তানিয়ার” কাছ থেকে। ব্যাপারটা এই ... হঠাৎ আমরা লক্ষ্য করতে শুরুর করেছিলাম তার চেহারাটা সুন্দর, এমন কি তাকে এক চেনা চিত্তাকর্ষক মতো দেখাচ্ছে। ডিভিসনের সহকারী সেনাপতি ছিল তলিয়া আর্থিপভ। সেই প্রথম লক্ষ্য করে ব্যাপারটা। আর সেখানেই সে থেমে যায় না — সোজা সে প্রেমে পড়ে তানিয়ার। তানিয়াও এখন অদ্ভুত স্বপ্নালু চোখে তাকায় তলিয়ার দিকে। পরস্পরের কাছে থাকলে তারা লজ্জা পায়। সঙ্গীদের তারা এড়িয়ে চলে, নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে গোপন কথা। এই সব বিষয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি — কোনো ফল হয়নি। তলিয়া শুরুর করল ডিভিসনের কাজকর্মে অবহেলা করতে। শেষটায় আমাদের সঙ্গ একেবারে ছাড়ল। বলল, ইন্সকুলের পিছিয়ে যাওয়া লেখাপড়া তাকে করতে হবে। তার অল্পদিন পরেই তানিয়া দল ছেড়ে চলে গেল। সেই বসন্তে

ডিভিসনটা একেবারে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল, আমাদের পথের গৃহযুদ্ধের হল শেষ।

দেখলাম হাতে আমার অনেক সময়। সম্ভবত সেকারণেই আমিও তানিয়ার প্রেমে পড়ে গেলাম। অন্য কোনো কারণ খুঁজে পাই না। যাই হোক, এতে ভালিয়া আর্থিপুন্ডের ওপর রাগটা দ্বিগুণ হয়ে উঠল। তখনও আমি বুকিনি সেটা হিংসে। কিন্তু আমার নিশ্চিত ধারণা ছিল যে ভালিয়াই আমার জীবনে সর্বনাশের কারণ।

ভালিয়ার সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলি। সত্যি কথা বললে বলতেই হবে সে ছিল ভারি ভদ্র। আর যেটা আরো বড় কথা, অনেক বই পড়েছিল সে। আসলে সেই আমাদের প্রথম বলেছিল চাপায়েভ আর “কাম্পেল বাহিনীর” কথা। তখনো সিনেমায় তা দেখিনি আমরা। তার কাছ থেকে আরো অনেক বিষয় আমরা শিখেছিলাম ... মনে আছে একদিন উঠনে এসে সে আমাদের বলেছিল, “আমরা কেউই কোনো কর্মের নই। পাভেল কর্চাগিনের কথাটা ধর। মানুষের মতো মানুষ ...” তারপর সে বলতে শুরু করেছিল তাঁর সব কথা। পরে আমি বইটা পড়ি। বাস্তবিকই বুঝেছিলাম পাভেল ছিলেন বীরের মতো বীর। তাসত্ত্বেও আমি কিন্তু ভেবেছিলাম, “যুদ্ধ যেখানে হচ্ছিল সৌভাগ্যক্রমে পাভেল ঠিক সেই জায়গাটিতেই ছিলেন। কিন্তু শ্বেত-রক্ষীরা আমাদের পথে একবার আসুক না — দেখবে আমরাও কিমিচ্ছি না।” বইটা যেদিন শেষ হয় “কাম্পেল

বাহিনীকে” সৌদিন আমরা তুলো ধুনে দিই। বিনাগুণেই যে ভালিয়া আমার ডিভিসনের কমিসারের মতো ছিল তা নয়: সব গুণেই তার ছিল, সেই সম্মানজনক পদের জন্য ভালিয়া ছিল উপযুক্ত। তাছাড়া তার সাহসও ছিল প্রচুর। শত্রুপক্ষ আমার চেয়েও তাকে বেশি ভয় পেত।

এখন এই ভালিয়া আমার পথের কাঁটা হয়ে উঠেছে। অনেকক্ষণ ধরে মাথা ঘামালাম আমার প্রতিদ্বন্দ্বীকে বাধা দেবার অজস্র উপায়ের কথা ভেবে। শেষটায় ঠিক করলাম তানিয়ার সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করব ... সেটা ছিল বসন্তের এক শান্ত দিন। পাতলা বরফে মাটি ঢেকে গেছে। পায়ের তলায় রুটির গুঁড়োর মতো মচমচ করে, শব্দটা শুনলেই ক্ষিদে পেয়ে যায়। ঝাঁকে ঝাঁকে দাঁড়কাক গোলাপী আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে, তাদের পাগলাটে চিৎকারে মস্কা ভরা। ইস্কুলের ছুটির পর তানিয়া আর আমি বাড়ি ফিরছিলাম। অসুখ হওয়ায় ভালিয়া তখন ইস্কুলে আসেনি। মনখুঁলে কথা বলার এরচেয়ে ভালো সুযোগ আর হয় না। স্পিরিটনভ্কা আর সাদভায়া স্ট্রীটের মোড়ে দাঁড়িয়ে আমরা দাঁড়কাকগুলোকে ঝাঁক বেঁধে উড়তে দেখলাম। গোলাপী আকাশের দিকে মুখ তোলায় তানিয়ার মুখটাও গোলাপী হয়ে উঠেছে। সেই মুহূর্তে তাকে দেখাচ্ছে ভয়ঙ্কর সুন্দর।

তানিয়া বলল, ‘ভালিয়ার আবার ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছে। ও

কিন্তু একটু দ্বর্বল ধরনের। আমার মতে সহজেই ওর ছোঁয়াচ লাগে।’

স্বর শব্দে মনে হল তার মনটা বদলেছে।

‘তার মধ্যে এমন কী তুমি দেখতে পাও?’ আমি প্রশ্ন করলাম।

তানিয়ার চোখে বিস্ময় ফুটে উঠল। তারপর মনে হল কথাটা সে যেন বুঝেছে। আমার হাতটা কাঁপছিল। হাতটা তুলে নিয়ে সে বলল, ‘চলো, যাওয়া যাক ...’

চুপচাপ আমরা স্পিরিটনভকা স্ট্রীট ধরে চললাম। তানিয়া চলেছে সামান্য আগে আগে। আমার হাতটা তখনো তার হাতে। আমাদের বাড়ির সামনে এসে থামতে সে আমার হাতটা ছেড়ে দিল।

‘তুমিও ভালো, কিন্তু ভালিয়া অন্য ধরনের,’ আমার দিকে না তাকিয়ে সে বলল।

‘তুমিই বলিছিলে না যে সে দ্বর্বল আর — আর কী যেন কথাটা বলিছিলে —’ আমি বলতে শুরু করলাম, টগবগ করে উঠল আমার রক্ত।

বাধা দিয়ে তানিয়া বলে উঠল, ‘সে একেবারে আলাদা ধরনের, একেবারে আলাদা। বল তো, আজীবন আমাকে কি তুমি কোলে করে নিয়ে যেতে পারবে? বল, পারবে কী?’

কথাটার আশ্চর্যিক মানে বুঝে ভাবতে লাগলাম।

‘দেখলে তো!’ ঠাট্টা করে বলে উঠল তানিয়া। ‘কথাটা তোমাকে ভাবতে হচ্ছে, কিন্তু ভালিয়া ও কথাটা আমাকে রোজই বলে। প্রতিদিন!..’ শেষ দ্বুটো কথা চেঁচিয়ে বলে পাথরের স্ফুড়ঙ্গের মতো প্রবেশপথে সে দৌড়ে চলে গেল। এতো জোরে বলেছিল যে পাশ দিয়ে যারা যাচ্ছিল ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল।

আমি পান্নিয়াশিঁয়ে পুকুরে গিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত একটা বেঁগুতে বসে রইলাম। পরের দিন ইস্কুলে আমার পাশ দিয়ে ছুটে যেতে যেতে তানিয়া একটা বই আমার হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, ‘যেখানটা দাগ দিয়েছি, পোড়ো।’

বইটা মাক্সিম গোর্কির ছোট গল্প সংকলন। আমি উঠনে গিয়ে একটা কয়লা গাদার পিছনে লুকিয়ে বইটা খুললাম। যে লাইনটার তলায় দাগ দেওয়া সেটা হল: “যদি কখনো প্রেমে পড়ি তাহলে পড়ব চিরকালের জন্য।”

এক গল্পের নায়িকার কথা ওগুলো। সেগুলোর তলায় মোটা করে দাগ দেওয়া আর পাশে একটা বিরাট বিস্ময়ের চিহ্ন। সেদিন ইস্কুল থেকে পালিয়ে সমস্ত বইটা পড়লাম। খুঁজতে লাগলাম এমন একটা যুঁতসই লাইন যেটা আমার উত্তর হতে পারে। সে রকম লাইন খুঁজে পেলাম না। তাই সে পাতাতেই লিখলাম, “যখন মন বদলাবে, হয়তো দেখবে খুব দেরি হয়ে গেছে।” আমিও একটা বিস্ময়ের চিহ্ন বসলাম। মনে হল সেটার আকার কথাগুলোর চেয়ে কম অর্থপূর্ণ নয়। পরের দিন বইটা দিলাম তানিয়াকে...

খুব স্পষ্ট মনে আছে সেদিন ছিল শুক্রবার। শনিবার আমার ১০৩° জ্বর হল। নিউমোনিয়া হয়েছিল। মা পরে প্রায়ই বলতেন আমার বেঁচে যাওয়াটা একটা অলৌকিক ব্যাপার। সেরে ওঠার পর দক্ষিণে আমার খুঁড়ির বাড়িতে আমাকে নিয়ে যাওয়া হয়। পুরো গ্রীষ্মকালটা সেখানে কাটাই। শরতে আমার বাবা-মা আসেন সেখানে থাকতে। এইভাবে শেষ হয় আমার প্রথম প্রেম। নতুন করে আর কখনো শব্দ হয়নি, কিন্তু কখনো ভুলে যাইনি তার কথা...

হালে আবার মস্কোতে এসে ট্রলিবাসের জন্য কিউ করে দাঁড়িয়েছি। শীতকাল, সাংঘাতিক ঠাণ্ডা দিনটা। লম্বা একটা ফ্ল্যাট-বাড়ির ছাদের উপর কমলা রঙের চাকতির মতো সদৃশতা ভেসে রয়েছে। বিশ্বাসই করা যায় না এই সদৃশ্যই তাপ ছড়ায়। রাস্তায় পড়ে রয়েছে টুকরো টুকরো তুহিনময় কুয়াশা। মোটরগাড়ি থেকে দমকা বেরিয়ে-আসা শাদা ধোঁয়া সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে যাচ্ছে। এতো ঠাণ্ডা যে নিশ্বেস নিতে কষ্ট হচ্ছে। ট্রলিবাসটা আর আসেই না।

‘আপনি কি কিউ’র শেষে?’ কে একজন আমায় প্রশ্ন করল।

‘তাই তো মনে হচ্ছে,’ দস্তানা দিয়ে অবশ্য একটা কান ঘষতে ঘষতে বিড়বিড় করে বললাম।

‘ভালো কথা, চাপায়েন্ডের ব্যবহার কিন্তু এরচেয়ে ভালো

ছিল,' আমার পিছন থেকে সেই একই গলা শোনা গেল। ঠিক তখনই বন্ধুতে পারিনি কথাগুলো আমার উদ্দেশ্যে বলা। তারপর মূখ ফিরিয়ে দেখলাম এক লম্বা সুন্দরী মহিলাকে। আমার দিকে সোজা তাকিয়ে সে মৃদু হাসল।

‘তড়বড়ে তানিয়া,’ আমার কথাটা অনেকটা প্রশ্নের মতোই শোনাল।

‘বীর সেনাপতি,’ আমারই মতো সুরে বলল মহিলাটি।

প্রথমে আমরা কী যে বলাবলি করেছিলাম সেকথা মনে নেই—সম্ভবত ঐ অবস্থায় সবাই যে ধরনের সাধারণ অর্থহীন কথা বলে থাকে তাই।

একসঙ্গে ঠেলাঠেলি করে ট্রলিবাসের ভিড়ের মধ্যে ঢুকে কাছাকাছি মূখোমুখি দাঁড়িয়ে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে পরস্পরকে দেখতে লাগলাম। আমার নিজের ভাবনাগুলোকে দেখলাম তার চোখে ... দিনের পর দিন আয়নায় নিজের ছবি দেখলে চেহারার উপর সময়ের যে ছাপ পড়েছে আমরা তাতে অভ্যস্ত হয়ে উঠি। রগের কাছের পাক-ধরা চুল, মুখের বলিরেখা, দাঁতের যে-ঔজ্জ্বল্য দেখলে স্পষ্ট বোঝা যায় এ নকল দাঁত—সবকিছুই সয়ে যায়। কিন্তু বহু বছর পর কারও সঙ্গে দেখা হলে এসব কথা হঠাৎ পড়ে যায় মনে।

চুপচাপ আমরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

‘কেমন আছো?’ প্রশ্ন করেই এই মামুলি কথাগুলোর জন্য লজ্জা পেলাম।

‘মন্দ নয়। মাঝেমাঝে ভারি অদ্ভুত ঘটনা ঘটে!.. আজকেই ভালেস্তিন আর আমি তোমার কথা বলাবলি করছিলাম।’

‘ভালেস্তিন কে?’

‘ভুলে গেছে! ভালিয়া আর্থিপভ! সে আমার স্বামী। আমি শেষ পর্যন্ত মন বদলাইনি...’ বলে তীতিয়ানা হেসে উঠল।

‘কোন বিষয়ে?’

‘হা ভগবান! এভাবে সর্বকিছু ভুলে গেছো বলে তোমার লজ্জা করছে না? মনে নেই আমার জন্য তুমি যে লিখে দিয়েছিলে “যখন মন বদলাবে, হয়তো দেখবে খুব দেরি হয়ে গেছে”? বইটা এখনো আমার কাছে আছে। আমাদের বাড়িতে যদি আসো তাহলে বাস্তব প্রমাণটা তোমায় দেখাব... এসো একদিন আমাদের সঙ্গে দেখা করতে। তোমাকে দেখলে ভালেস্তিন খুব খুঁসি হবে। তুমিই ছিলে তার সবচেয়ে বড় বন্ধু!..’ বেরবার দরজার দিকে ঠেলতে ঠেলতে এগিয়ে নামার সময় সে চোঁচিয়ে বলল, ‘নিশ্চয়ই এসো। সেই পুরনো বাড়িতেই আমরা আছি!..’ সে হাত নাড়াল।

পরের রবিবার ঠিক করলাম তাদের সঙ্গে দেখা করতে যাব। যে ফ্ল্যাট-বাড়িতে আমার ছেলেবেলা কেটেছে সেখানে যখন পৌঁছলাম তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে। আগেও প্রায়ই নানা কাজে তার পাশ দিয়ে গিয়েছি। কিন্তু এখন যে রকম আবেগে আমার মনটা ভরে উঠল আগে কখনো তা অনুভব করিনি।

সদৃশের মতো প্রবেশপথে ঢোকান সঙ্গে সঙ্গে মস্তবড় একটা তুষার বল আমার বুকে এসে লাগল। আর “ফ্যাশিস্টদের শেষ করে দাও!” বলে চেঁচাতে চেঁচাতে দেখা দিল এক দল লড়িয়ে ছেলে। তরুণ ছেলের দল যুদ্ধ করছে, এক দিন আমরা যে রকম করতাম। দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আমার পাশ দিয়ে দৌড়ে লড়াই করতে করতে ছেলেদের পেরিয়ে যেতে দিলাম।

‘পত্রিশ’কিন, ফ্রন্ট থেকে ওদের ধরে আনো!’ ঝাঁকড়া চুল একটি ছেলে চেঁচিয়ে উঠল, আর তৎক্ষণাৎ ছেলেরা অদৃশ্য হয়ে গেল ...

এ-ধরনের খেলা আমরা খেলিনি। ছেলেমেয়েদের খেলার উপরেও পড়েছে সময়ের ছাপ। সেই ইমার্জেন্সি-মইটাও রয়েছে, যেটা বেয়ে একবার আমি উঠেছিলাম সবুজ মাঠ দেখতে পাবার আশায় ...

তানিয়া নিজেই দরজা খুলল। আমাকে দেখে অবাক হয়ে গেল সে — অন্তত তাই আমার মনে হল। মনে হল আমাকে তার বাড়িতে আমন্ত্রণের কথাটা ভদ্রতার খাতিরেই বলেছিল, লোকে যেমন বলে থাকে তেমনি। বাস্তবিকই সে আশা করেনি আমি আসব। আমি যখন কোট খুলছি সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর প্রায় নীরস গলায় বলল:

‘এই দিকে ...’

অন্ধকার করিডর থেকে রৌদ্রোজ্জ্বল ঘরে এসে সঙ্গে সঙ্গে সর্বকিছু লক্ষ্য করতে পারলাম না। তানিয়া এক পাশে দাঁড়িয়ে

উত্তেজনায টানটান হয়ে আমাকে লক্ষ্য করতে লাগল। ডান দিকে তাকিয়ে চোঁকো শাদা বালিশের উপর একজোড়া উজ্জ্বল কালো চোখ দেখতে পেলাম। প্রথমেই সে দুটো আমার চোখে পড়ল। তখনই শব্দ দেখতে পেলাম উঁচু বালিশে ঠেস-দেওয়া একটি মানুষের দীর্ঘ দেহ। ভাবলাম, তানিয়ার বাবা হবেন। কারণ জানতাম না অনেক দিন আগে তিনি মারা গেছেন। কিন্তু তারপর স্বরটা শুনতে পেলাম।

‘চাপায়েভ, কাছে আসছো না কেন? তোমার কমিসারকে একবার তোমায় দেখতে দাও ...’

কোনো সন্দেহ রইল না — এ ভালিয়া আর্থিপভ। ধীরে ধীরে কাছে গেলাম, হঠাৎ উঠলাম ভয় পেয়ে। শীর্ণ মদ্রু আর চাদর-ঢাকা তীক্ষ্ণ কাঁধদুটো এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। চাদরটার তলা থেকে একটা শাদা হাত পিছলে বেরিয়ে এল, আমার হাতটা ধরবে বলে। শিথিল হাতটায় চাপ দিয়ে যেন অবলম্বনের জন্য তাকালাম তানিয়ার দিকে। আর সে-ও বদ্বতে পেরে কাছে এসে আমার জন্য একটা চেয়ার ঠেলে দিয়ে ভালেস্তিনের পায়ের কাছে বসল। আমিও বসলাম। বদ্বতে পারলাম না কী বলব। অসদৃশ লোকের সঙ্গে কথা কইতে আমার বিশ্রী লাগে, নিজে সদৃশ বলে কেমন যেন লজ্জা হয়...

অস্বাভাবিক ফুতির সদ্বতে বললাম, ‘কিহে, তোমাকে যে চেনাই মদ্রুশকিল। পথে তোমার সঙ্গে দেখা হলে কিছদ্বতেই চিনতে পারতাম না!’

‘ও নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই : কখনো আমি বাইরে যাই না ...’ মৃদু হেসে শান্ত সুরে সে বলল।

তার দিকে আতঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম।

‘ভয় পেয়ো না,’ বলে সে তার হালকা হাতটা আমার হাঁটুর উপর রাখল। ‘তোমায় সব ব্যাপারটা বলছি ... হালে যে একটা যুদ্ধ হয়ে গেছে সে-কথা তোমাকে মনে করিয়ে দেবার দরকার আছে বলে মনে হয় না। ব্যস ... আমার ওপর ছিল একটা ব্যাটালিয়নের ভার। বেলোরুশিয়ায় এগুবার সময় আমার তিন পা দূরে একটা গোলা ফাটে। আমাকে টুকরো-টুকরো করে না ফেলে সেটার তিনটে টুকরো আমার শিরদাঁড়ায় গেঁথে যায়। এক ডাক্তারের ভাষায় বলি, “শিরদাঁড়া হল একটা খোঁটা, সমস্ত শরীরটাকে খাড়া করে রাখে।” আমার খোঁটাটা আমাকে আর খাড়া করে রাখে না। আমাকে শূন্যে থাকতে হবে। স্নেফ শূন্যে থাকা, আর কিছূ নয় ... বুদ্ধলে ?’

যখন বুদ্ধলাম আমাকে একটা প্রশ্ন করা হয়েছে তার আগে নিশ্চয়ই কয়েক মিনিট কেটে গিয়েছিল। শূন্যকনো ঠোঁট নেড়ে বিড়বিড় করে কী একটা বললাম। কিন্তু আমার চিন্তা তখন বহু দূরে চলে গেছে অতীতের মধ্যে ... “বল তো, আজীবন আমাকে কি তুমি কোলে করে নিয়ে যেতে পারবে ? বল, পারবে কী ? কিন্তু ভালিয়া ও কথাটা আমাকে রোজই বলে। প্রতিদিন !..” আবার মনে হল তানিয়াকে চিৎকার করে ঐ শেষ কথা দুটো বলতে শুনতে পাচ্ছি। তার স্বরটা পাথরের স্ফুটনের

মতো প্রবেশপথে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, ডুবিয়ে দিয়েছে অন্য সব শব্দকে... তানিয়ার দিকে তাকালাম। সে সময় তার মদুখটা ভালেন্তিনের দিকে ফেরানো, সেখানে ফুটে উঠেছে মৃদু হাসি।

‘এই ভাবে আমরা থাকি,’ তানিয়া বলল। তখনও সে ভালেন্তিনের দিকে তাকিয়ে।

ঘরে এমন অনেক কিছুর রয়েছে যাতে আমার মনে পড়ে গেল নিকলাই ওস্ট্রভস্কির কথা। লেখক যখন বেঁচেছিলেন সেখানে বার কয়েক গিয়েছিলাম। হাত বাড়ালেই যাতে মেলে তাই বিছানার কাছে রয়েছে অনেক বই। একটা ভাঁজ-করা ডেস্ক দেয়ালের গায়ে লাগানো। ভালেন্তিন যখন লিখতে চায় তখন সেটাকে বিছানার উপর বসিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু সবচেয়ে বেশি করে চোখে পড়ল উঁচু-করা বালিশে ঠেস-দেওয়া মানুখটাকে আর তার হালকা প্রায় স্বচ্ছ হাতদুটো। কোথায় একটা টেলিফোন বেজে উঠল। তানিয়ার মা এলেন ঘরে।

‘ভালিয়া, তোমার টেলিফোনের স্লুইচটা টেপো,’ তিনি বললেন।

টেলিফোনে যা বলা হল এতো মন দিয়ে শুনিয়েছিলাম যে এখন তার প্রতিটি কথা নিভুলভাবে বলতে পারি।

‘হ্যাঁ, কথা বলছি। ধন্যবাদ। খুব ভালো আছি... হ্যাঁ... হ্যাঁ... এক মিনিট, আপনার শেষ কথাটা ঠিক শুনতে পাইনি... দয়া করে আর একবার বলুন... হ্যাঁ... ঠিক তাই, ঠিক ওখানটাতেই আপনার ভুল হয়েছিল ... আপনার অঙ্কটার সঙ্গে

ঐ ফরমুলাটার কোনো সম্বন্ধ নেই ... নিশ্চয়ই তাই আর কি!.. আমাকে ধন্যবাদ দেবার কিছুই নেই। পরের বার শ্রদ্ধা আপনার চোখদুটো খোলা রাখবেন... ভালো... সমস্তটা আর একবার দেখে নিয়ে আমাকে টেলিফোন করবেন... আচ্ছা... আপনার টেলিফোনের অপেক্ষায় থাকব... বিদায়...’

ভালেন্তিন রিসিভারটা নামিয়ে অমায়িক শ্রদ্ধা হেসে বলল:

‘ও ছোকরার বেশ বুদ্ধি আছে কিন্তু মাঝে মাঝে প্রেরণায় পড়ে কবিরী যেমন ব্যাকরণ ভুলে যায় ও তেমনি করে ... তোমায় বলিনি, গণিতই এখন আমার পেশা...’

‘এখন কেন?’ আপত্তি জানাল তানিয়া। ‘যুদ্ধের আগেই তো তুমি গণিত বিভাগ থেকে গ্র্যাজুয়েট হয়েছিলে...’

‘সত্যি বলতে কি হইনি। রাষ্ট্রীয় পরীক্ষাটা দিইনি।’

‘কী করে তুমি সৈন্যদলে ঢুকেছিলে?’ কী বলছি বোঝবার আগেই কথাগুলো আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল।

ভালেন্তিন আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে শান্তভাবে অথচ জোর দিয়ে বলল:

‘কী করে সৈন্যদলে ঢুকেছিলাম? তার মানে? স্বেচ্ছায় ঢুকেছিলাম। তুমি সৈন্যদলে ছিলে না?’

‘ছিলাম, যুদ্ধ সাংবাদিক হিসেবে...’ খানিকটা হকচাকিয়ে গিয়ে উত্তর দিলাম।

‘ওঃ,’ সে হেসে উঠল। ‘“ট্রেসারের শব্দ শোনা গেল। আর নাজি প্লেনটা পড়ল ঝপ করে!” এই ধরনের লেখা তো?..’

‘মাঝে মাঝে ...’

‘নিশ্চয়ই রাগ করোনি... অঙ্কশাস্ত্রজ্ঞদের মধ্যেও ও ধরনের লোক আছে... যাই হোক এটা অবশ্য অন্য কথা... তানিয়া, টেবিলটা এখানে নিয়ে এসো, আর ডিকান্টারটাও বার করো। আমাদের এই দেখা হওয়ার উদ্দেশ্যে একটু মদ খাওয়া যাক।’

টেবিলের উপর তিনটে মদের গেলাস তুলে আমরা কাছাকাছি সরে এলাম। আগের চেয়ে স্বস্তিবোধ করতে লাগলাম। চাপায়েভ ডিভিসনের বিখ্যাত সৈনিক “তড়বড়ে তানিয়ার” স্বাস্থ্যের উদ্দেশ্যে আমি একটা টোষ্ট প্রস্তাব করলাম। মদটা খাওয়া হলে তানিয়া বলল ভালেস্তিনের আর খাওয়া ঠিক হবে না। ডিকান্টারটা সে সরিয়ে ফেলল। তারপর বলল বিশ্ববিদ্যালয়ের এক পরীক্ষার জন্য তাকে পড়তে হবে। সেল্ফ থেকে একটা বই নিয়ে সে বেরিয়ে গেল।

ভালেস্তিন আবার তার হালকা হাতটা আমার হাঁটুর উপর রাখল।

শান্ত স্বরে বলল, ‘ধন্যবাদ। টোষ্টটার জন্য ধন্যবাদ...’
মুহূর্তের জন্য সে চুপ করল। ‘এই বিশাল পৃথিবীতে তানিয়াকে পাওয়া আমার পক্ষে যে কী সে কথা তুমি কল্পনা করতে পারবে না। সে না থাকলে জানি না আমার কী হত...
উরালের এক হাসপাতালে সে আমার খোঁজ পায়। তারপর এখানে নিয়ে আসে। তখন থেকে বলতে গেলে সে তার ঐ

ছিপিছিপে হাত দিয়ে আমায় বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে ... “বিজ্ঞান ক্যান্ডিডেটের” ডিগ্রীর পরীক্ষা আমি পাশ করেছি। শীগ্গিরই আমার থিসিসটা পেশ করব। বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে কিছু কাজ করছি ... এসবের দরুনই ওর কাছে আমি ঋণী, শূদ্ধ একমাত্র ওর কাছেই ... তানিয়া অভিনেত্রী হতে চেয়েছিল। কিন্তু আমার জন্য অঙ্ক বিভাগে ঢুকেছে ... স্ত্রীদের বলা হয় “অর্ধাঙ্গিনী”। কিন্তু তানিয়া আমার চার ভাগের তিনভাগ। তার চেয়েও বেশি ... সেই আমার জীবন ...’

ধীরে ধীরে নীচু গলায় সে কথা কইছিল। তার দৃষ্টি চলে গিয়েছিল আমাকে ছাড়িয়ে বহু দূরে। খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে সে বলল:

‘তুমি বিয়ে করেছো?’

‘করেছিলাম ... ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে ...’

‘আমি জানি নিশ্চয়ই তুমি আমাকে ক্ষমা করবে ... কিন্তু কী করে এটা হয় আমি বদ্বতে পারি না ... একেবারেই বদ্বতে পারি না ... নিশ্চয়ই তখন ছাড়াছাড়ি হয় যখন মানুষ পরস্পরকে ভালোবাসে না, শূদ্ধই একসঙ্গে ভেসে চলে ... কিন্তু আমার কপালটা কি ভালো বলবে? নাকি তোমার মতে আমাদের এলাকায় যত ভালোবাসা ছিল নিজেই সেটা দখল করে, সবটা নিজেই একা দখল করে বসে আছি? ..’

সে যখন মৃদু স্বরে হাসছে, টেলিফোনটা বেজে উঠল। আবার খানিকক্ষণ ধরে সে কথা কইল ... তারপর আবার আমরা

ছেলেবেলার কথা বলতে লাগলাম। আমাদের বন্ধুদের ভাগ্যে কী ঘটেছে না ঘটেছে, যা জানি পরস্পরকে জানালাম ...

তাড়াতাড়ি ঘনিয়ে-আসা শীতের প্রদোষ অন্ধকারের মধ্যে আমি বিদায় নিলাম। স্পিরিটনভ্কা আর সাদভায়া স্ট্রীটের মোড়ে এসে আপনা থেকেই গেলাম থেমে। আকাশে ঝাঁকে ঝাঁকে দাঁড়কাক উড়ছে। কিন্তু আকাশটা এখন আর গোলাপী নয়। অন্য পাশে একটা নতুন বড় ফ্ল্যাট-বাড়ির সামনে দড়ি তরুণ তরুণী দাঁড়িয়ে। থেকে থেকে মেয়েটি চলে যাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু ছেলেটি ধরে রয়েছে তার হাত। সেখানে দাঁড়িয়ে তারা দেখতে লাগল দাঁড়কাকগুলোকে দ্রুত এদিক ওদিক উড়তে আর কী যেন বলাবলি করতে লাগল ... তারা কী বলল শুনে পেলাম না। কিন্তু আমার কেমন যেন মনে হল তারা বলছিল খাঁটি প্রেমের কথা — মহৎ কর্মের মতো যেটা সুন্দর আর জীবনের মতো শাস্ত ...

বাড়ি ফিরে আমি কয়েকটা কথা টুকে রাখলাম যেকোনো সাংবাদিকই তার নোট বইতে নিজের অভিজ্ঞতার কথা যেমন জমিয়ে রাখে। আমার ছেলেবেলাকার বন্ধুদের নিয়ে কয়েকটা গল্প খাড়া করার কথা পরে আমার মনে আসে ...

কুড়ি বছর পরে ...

“তড়বড়ে তানিয়া” আর ভালিয়া আর্থিপভের কী ঘটেছে জানতে পারার প্রায় একবছর পরে আমার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যায় ফেদিয়া পেদ্রভের, সে ছিল আমাদের ডিভিসনের প্রথম কম্যান্ডার ...

আমরা ছিলাম মস্কোর বহু ফ্ল্যাট-বাড়ির মতোই এক ফ্ল্যাট-বাড়ির অল্পবয়সী পড়শীর দল। নিজেদের ভবিষ্যতের কথা ভাবতামই না। একদিন ইস্কুলে যখন আমাদের সাহিত্যের শিক্ষয়িত্রী ভেরা পাভ্‌লভ্‌না হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, ‘তোমরা কার মতো হতে চাও?’ তখন প্রশ্নটা শুনে আমরা হকচকিয়ে গেলাম। অবশ্য বইয়ের নানা চরিত্রের কথা তিনি ভেবেছেন... সবাই আমরা ভাবতে শুরু করে দিলাম। চারিদিক একেবারে চুপচাপ হয়ে গেল। অল্প পরে ক্লাসের সেরা ছাত্র বরিস ইৎসখকিনকে ভেরা পাভ্‌লভ্‌না ডাকলেন। ছেলোটো রোগা, তার ছোটো তীক্ষ্ণ নাকের উপর বিরাত একটা হর্ণারিমের চশমা। আমাদের মাথার উপর দিয়ে তাকিয়ে সে চটপট বলল :

‘আমি হাইয়াভাথা’র মতো হতে চাই...’ তারপর খানিক থেমে যোগ করে দিল, ‘অবশ্যই দাঁতেসের মতো হতে চাই না...’

“দাঁতেসটা সত্যিই ভারি বাজে লোক ছিল — মেরে ফেলেছিল পদুশকিনকে,” মনে মনে ভাবলাম। “কিন্তু হাইয়াভাথা’র কথা আলাদা। খরস্রোতা নদীতে ডিঙি বেয়ে জোরে ছোট্ট তুলনা হয় না!..” কিন্তু তারপর হাইয়াভাথাকে হর্ণীরিমের চশমা-পরা কল্পনা করে চাপা হাসিতে আমার দম বন্ধ হয়ে এল। ফলে কটমট করে আমার দিকে তাকালেন ভেরা পাভ্‌লভ্‌না।

তিনি বললেন, ‘কথাটা কি এতোই হাসির? যখন তোমাকে কিছ্‌ বলা হয় তখন দাঁড়িয়ে উঠবে!.. আচ্ছা, তোমার উত্তরটা এবার শোনা যাক। কিন্তু দেখো, তোমার কথা শুনতে সবাই না হেসে ফেলে।’

কী উত্তর দেব ভেবে পেলাম না। চুপ করে রইলাম।

জীবনে কিন্তু ভিন্নভাবে ভবিষ্যতের পরিকল্পনাটা আমাদের মাথায় আসে... যেমন, একদিন আমাদের বাড়ির সব ছেলেদের মনে হয়েছিল সবাই আমরা ড্রাইভার হব, অন্য কিছ্‌ হতে মন আমাদের ওঠেনি। তার কারণটা বলছি ... আমাদের দলে ফেদিয়া নামে একটি ছেলে ছিল। বয়সেও সে আমাদের চেয়ে কিছ্‌ বড়। ফেদিয়া ছিল ডিভিসনের কম্যান্ডার। প্রায়ই আমাদের সে বলত এমন কতকগুলো জিনিস সে জানে যা সম্বন্ধে আমাদের কোনো ধারণাই নেই। শূদ্ধ সেটা হলে আমরা

বরদাস্ত করতে পারতাম। কিন্তু আরো একটা ব্যাপার ছিল...
 ফেদিয়ার মা ছিলেন। ভদ্রমহিলার গলাটি দারুণ হেঁড়ে, ভারি
 বদরাগী। তারা দু'জনে থাকত মাটির নীচের ঘরে। ফেদিয়ার
 মা অন্যদের কাপড় কাঁচত। শীতকালে তাদের নীচু জানালাটা
 সারা দিন ধরে থাকত আধ-খোলা। সাবানের গন্ধ-ভরা নীল
 বাষ্পের স্রোত বেরুত তার ভিতর থেকে। ফেদিয়ার বাবা
 তাদের সঙ্গে থাকত না। ফেদিয়া বলত, “বাবা আর একটা মেয়ের
 সঙ্গে থাকে। সে মরার সামিল!” স্পষ্টতই কথাটা সে শুনেনিছিল
 তার মার কাছ থেকে। কিন্তু যে লোকটা “মরার সামিল”
 মাঝেমাঝে সে দেখা দিত। তাকে আমরা বেশ ভালোই চিনতাম।
 সে ছিল ড্রাইভার, সাধারণত আসত ঝকঝকে মোটরগাড়ি করে।
 দৌড়ে রাস্তায় আমরা যেতাম। সে যখন গাড়ির দরজায় চাবি
 দিত আমরা সসম্ভ্রমে চারিদিকে দাঁড়িয়ে দেখতাম। সব
 দরজাগুলো পরীক্ষা করে, আর সব টায়ারগুলোয় ব্দুট দিয়ে
 টোকা মেরে আমাদের দিকে না তাকিয়েই সে অদৃশ্য হত
 ফেদিয়ার ফ্ল্যাটে। আমাদের সঙ্গে ছেড়ে ফেদিয়া বাড়ি যেত, তার
 অনিচ্ছার ভাবটা আমাদের বোঝাতে চেষ্টা করত। কিন্তু যেতেই
 হত তাকে। ফলে আমাদের ডিভিসনটার হত দুর্বস্থা... আসল
 মুশকিল ছিল ফেদিয়া'র মাকে নিয়ে। দিনকের দিন অবস্থাটা
 খারাপ হয়েই চলল... একবার দারুণ যুদ্ধ হিচ্ছিল। আমাদের
 কপাল ছিল সেদিন মন্দ। শত্রুপক্ষ তাদের উঠন থেকে আমাদের
 ডিটাচমেন্টকে তাড়িয়ে এনেছিল আমাদের ফ্ল্যাট-বাড়ির

প্রবেশপথের পাথরের সড়ুঙ্গে আর “তড়বড়ে তানিয়াকে” নিয়ে গিয়েছিল বন্দী করে। বিরাট লজ্জার দরুন ভীষণ রেগে আমরা হিংস্র হয়ে উঠে দঃসাহসী পালটা আক্রমণ শুরুর করে দিই। হঠাৎ সবাইকার মনে হল উদ্ধত শব্দপক্ষ একটু পরেই ক্লান্ত হয়ে পড়বে আর আমরা প্রতিশোধ নিতে পারব। সেই চরম মুহূর্তে ফেদিয়ার মা-কে আমরা কাংসাকণ্ঠে চীৎকার করতে শুনিনি:

‘ফেদিয়া! এক্ষুনি বাড়ি আয় বলছি!’

মাথা নীচু করে ফেদিয়া চলে গেল। জেনারেল না থাকায় আমাদের সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। লজ্জা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার আর কোনো উপায় রইল না।

আমাদের মধ্যে অসন্তোষের গুরুজন উঠল। আমি তো বুদ্ধিতে পারলাম না এ-রকম মা-র সঙ্গে ফেদিয়া থাকে কী করে। পরের দিন ফেদিয়ার দেখা পাওয়া গেল।

সে বলল, ‘ঐ সব লড়াইটড়াই করা আমার আর হবে না! মা বলছে, হয় ভালো পড়াশুনো করতে হবে নয় তো গ্রামে পাঠিয়ে দেবে আমার কাছে...’

আতঙ্ক ও করুণা মেশানো দৃষ্টিতে তার দিকে আমরা তাকলাম। ভাবলাম, “বিশ্বাসঘাতক ... আর একটা ভালো ছেলে চলে গেল।” তার জায়গায় আমি এলাম ...

কিন্তু “পদত্যাগ করা” সত্ত্বেও ফেদিয়া ইস্কুলের বামেলা থেকে রেহাই পেল না। একই ক্লাসে তাকে থাকতে হল দ্বিতীয়

বছর। শরৎকালে সে আর ইঁস্কুলে ফিরে গেল না। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বালতি-বালতি সাবান-জল সে নর্দমায় ঢালার জন্য নিয়ে চলল, বিলি করতে লাগল কাচা কাপড়।

ছেলেমানুষদের মন বেশী দিন নালিশ পুুষে রাখে না। অল্প দিনের মধ্যেই ফেদিয়ার জন্য আমাদের দৃঃখ হল। তাকে আন্তরিকভাবে চাইলাম সাহায্য করতে। প্রশ্নটা দাঁড়াল, কী করে? আমাদের স্থির বিশ্বাস জন্মেছে তার মা-ই এ সবার জন্য দায়ী।

‘মা-র কাছ থেকে তাকে চলে যেতে হবে,’ রায় দিল ভালিয়া আর্থিপভ। সে নিজেই ছিল অনাথ, অনাত্মীয়দের সঙ্গে থাকত। তার সঙ্গে সবাই আমরা একমত হলাম। কিন্তু তব্দ বদ্বতে পারলাম না মা-র কাছ থেকে কী করে কেউ চলে যেতে পারে ...

সমস্যাটা নিয়ে তখনো সবাই মাথা ঘামাচ্ছি এমন সময় বালতি হাতে ফেদিয়া বেরিয়ে এল। ফিরতি-পথে সে এল আমাদের কাছে।

‘ফেদিয়া, শোন আমাদের উপদেশটা,’ কলিয়া লাস্কি তৎক্ষণাৎ তাকে বলল। ‘তোরা মা-র কাছ ছাড়তে হবে!’

‘মা-র কাছ ছাড়তে হবে, মানে?’ ফেদিয়া বলল। চোখদুটো তার কালো হয়ে উঠল — এটা মোটেই সদ্বক্ষণ নয়।

‘সোজা কথা, তাকে ছেড়ে যা, ব্যস ...’

তারপর যা ঘটল সেটা আমরা একেবারেই আশা করিনি। ফেদিয়া বালতিটা নামিয়ে কলিয়া লাস্কির কানে এক ঘূষি কষিয়ে দিল।

‘গাধা কোথাকার,’ সে বলল। তারপর বালতিটা তুলে নিয়ে চলে গেল বাড়ির মধ্যে।

একদিন সকাল সকাল ইস্কুল যাবার সময় প্রবেশপথ থেকে বেরিয়ে অনিচ্ছায় থেমে গেলাম। চারিদিকের সব কিছুদ্ধকে ঢেকে দিয়েছে রাতের বরফ। কয়েকজন ঝাড়ুদার বরফ সরিয়ে বরফ-গাদা বানাচ্ছে। সকালের আলোয় বরফের গাদাটা দেখাচ্ছে নীলচে। চোঁমাথায় এক ট্র্যাফিক-মিলিশিয়াম্যান এক লরির ড্রাইভার আর বাস ড্রাইভারের মধ্যে ঝগড়ার মধ্যস্থতা করছে। বাসে আর লরিতে ধাক্কা লেগেছিল। মৃদ্ধ হয়ে সবকিছুদ্ধ দেখিছিলাম আর শুনছিলাম — ড্রাইভারদের চেঁচামেচি, যারা সাক্ষী দিতে ইচ্ছুদ্ধ তাদের পরস্পর-বিরোধী সাক্ষ্য, ট্র্যাফিক-মিলিশিয়াম্যানের গাড়িগুলোর চারিদিকে ঘুরে বেড়ানো, তার মৃদ্ধে উদাসীন ভাব (এর চেয়ে খারাপ দুর্ঘটনা সে আগে অনেকবার দেখেছে!)। ঠিক তখনই ফেদিয়া আমার কাছে এসে বিস্ময়কর খবরটা জানাল।

সে বলল, ‘আমি একটা চাকরি পেয়েছি। আমার সেই বাবা যে গ্যারাজে কাজ করে সেখানে। মা ঠিক করে দিয়েছে ...’

বাস্তবিকই খবরটা হতভম্ব করে দেবার মতো! এ কথা

অবিলম্বে সব ছেলেদের জানানো উচিত। কোনো মতামত না দিয়ে সময় নষ্ট না করে তাড়াতাড়ি ইস্কুলে চলে গেলাম। ফেদিয়া নিশ্চয়ই এতে চটেছিল। আমাদের ভূগোলের মাস্টার রাগণী সেগেই য়েগরভিচের পিছন পিছন ঢুকলাম ক্লাস-ঘরে। ক্রমাগত অন্য ছেলেদের ইসারা করতে লাগলাম, যেন জানাতে চাচ্ছিলাম আমি একটা ভয়ানক খবর জানি। শেষটায় সেগেই য়েগরভিচ আমাকে বললেন মানচিচের কাছে যেতে। ইবেরিয়ান উপদ্বীপের সমুদ্রগুলোর নাম বলতে বললেন তিনি। সে সময় নামগুলো একেবারে মনে পড়ল না। চুপ করে মানচিচের দিকে অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে রইলাম।

গ্রীষ্মের প্রথম দিকে ফেদিয়াকে আমরা দেখলাম। পরনে তার তেলচিটে নীল ওভারঅল। সোঁখীন স্ফুটকেশে যেরকম বকবক করে বকলস্ লাগানো থাকে সেরকম বকলস্ তাতে লাগানো। একটা বুকপকেট থেকে বেরিয়ে রয়েছে কম্পাসের মতো ঠ্যাংওলা একটা যন্ত্র। কিন্তু সবচেয়ে আমরা অভিভূত হয়ে পড়লাম তার কথা শুনলে...

মোটরগাড়ির যে অংশটার চটকদার নাম গিয়ার-বক্স ফেদিয়া বারবার সেটার উল্লেখ করতে লাগল। “তিনটে সামনে যাবার আর একটা পিছনে যাবার গিয়ারওয়ালা” এই অংশটি সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কৌতূহলী হয়ে উঠলাম। তখনই আমরা ড্রাইভার হবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলাম। তলিয়া শেচবাকিভের মূখে ডিটেকটিভ ছাড়া অন্য কোনো কথা শোনা

যেত না। সে নিজেকে কল্পনা করে নিল, হাতে মাউজার নিয়ে গাড়ি করে ছুটে চলেছে অপরাধীদের পিছন পিছন। হায় তলিয়া! কে তখন কল্পনা করতে পেরেছিল যে তুমি একদিন প্রথম শ্রেণীর পাহাড়-চাড়িয়ে হবে আর মৃত্যু হবে তোমার পামির পাহাড়ে?..

পাম্পটা ঘিরে উঠনে আমরা বসেছি। জুলাই মাসের গরমে শরীর অবসন্ন। কেউ কোনো কথা বলছিল না। গরমে পীচ গলে আলকাৎরার গন্ধ বেরুচ্ছে। পাহারাউলির জানালার দিকে তাকাতে তাকাতে জল পাম্প করে আমাদের খালি পাগলুলো রাখছিলাম সেই বরফের মতো ঠাণ্ডা স্নোতে। পথ থেকে শোনা গেল একটা মোটরগাড়ির হর্ণ। কয়েকবার সেটা বাজল। সেখানে কিছ্ একটা ঘটছে বলে আমাদের মনে হল। দেখার জন্য দৌড়ে গেলাম বাইরে ...

গাড়িটা ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে। সেটা একটা ভ্যান। গায়ে বড় বড় অক্ষরে লেখা “রুটি”। স্টিয়ারিংয়ের সামনে বসে রয়েছে ফেদিয়া, তার হাতটা তখন হর্ণের উপর। আমাদের মুগ্ধ হয়ে তাকাতে দেখে তার খুব ভালো লাগল। এবার সে দেখাল পরের কায়দাটা। বেরিয়ে এসে সে ইঞ্জিনের ঢাকাটা তুলল, তারপর শব্দ করল সেখানে কিছ্ একটা খোঁচাতে। ইঞ্জিনটা আরো বেশি গর্জে উঠল। অল্পক্ষণ পরে খট করে ঢাকাটা বন্ধ করে গাড়িতে সে উঠে বসল। গাড়ির ভিতর থেকে শোনা গেল একটা দ্রুম করে শব্দ। ইঞ্জিনটা উঠল চিৎকার করে। ভ্যানটা সামনে

ছুটে অদৃশ্য হল পথের বাঁকে। সমস্ত ব্যাপারটা আশ্চর্য মনে হল ... পথে শূদ্ধ পড়ে রয়েছে ভ্যানের চাকার দাগ আর মৃত্যুর মতো এক ফোঁটা তেল।

পরের রবিবারটা ফেদিয়া আমাদের সঙ্গে কাটাল। খুব একটা ভারি কিছু চাল দেখাল সে। কিন্তু তাতে আমরা চটলাম না।

‘প্রত্যেকেরই কাজ করা উচিত,’ সর্বক্ষণ একটা জিপ শব্দ করে খুলতে আর বন্ধ করতে করতে গম্ভীরভাবে সে বলল। ‘কাজ লোককে শক্তি দেয়, মানুষের মতো মানুষ করে তোলে। পরে যখন বড় হবে তখন পাব পড়াশুনোর সময়। মা তাই বলে ...’

অবাক হয়ে হাঁ করে তার কথা আমরা শুনলাম। কী যে সে বলছে ভালো করে সে কথা বুঝতে পারলাম না কিন্তু। তাছাড়া যে সোঁখীন জিপটা ক্রমাগত সে খুঁটখুঁট করছিল সেদিকে চলে গেল আমাদের মন। শূদ্ধ কলিয়া লাস্কি মদ্রু হয়নি। স্পষ্টই বোঝা গেল ফেদিয়া তাকে যে ঘনিষ্ঠ কামিয়েছিল তার রাগটা সে ভুলতে পারেনি।

‘কি বুঝছি তুমি দিয়েছিলি,’ ফেদিয়া হঠাৎ তাকে বলল, ‘মা-কে ছেড়ে আসতে আমায় বলাটা। কাজটা হত যেন মোটরগাড়িতে উঠে স্টিয়ারিংটা ফেলে দেওয়া। কথাটা তোরই উপযুক্ত বটে, হাঁদা কোথাকার। মা —’ কথাটা শেষ না করে

ফেদিয়া চুপ করে গেল: তার মা বোরিয়ে এসেছে। আমাদের দম বন্ধ হয়ে গেল, অপেক্ষা করতে লাগলাম তার সেই স্বরটা শোনার জন্য। কিন্তু কী আশ্চর্য — চুপচাপ এসে আমাদের সঙ্গে তত্তাগাদায় সে বসল। তার লাল গাঁটওলা হাতদুটো রাখল হাঁটুর উপর।

‘তোরা কী বলছিল রে?’ মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করল সে।

আর তখনই, সেই প্রথম, আমি আবিষ্কার করলাম যে তার মৃদুতা স্নেহশীল। প্রায় আমার মায়ের মতো।

আমরা যখন ইয়াং পাইয়োনায়ারের টাই পরছি ফেদিয়া তখন যোগ দিল ইয়াং কমিউনিস্ট লীগে। এক রবিবার ধপধপে শাদা রুশি সার্ট পরে সে এল। কোমরে একটা নরম ট্যাসেল-ওলা বেল্ট। তার পাংলুনটা ঝকঝকে কালো কাপড়ের। খুব টেকসই বলে লোকে কাপড়টাকে বলে “শয়তানের চামড়া”। ঝকঝকে নতুন উঁচু বড়টের মধ্যে পাংলুনটা গোঁজা। মৃদুহৃৎটা বেশ মনে আছে — আমরা প্রবেশপথের সিঁড়িতে বসেছিলাম, ফেদিয়া ধীরেসদুস্থে আমাদের দিকে আসছিল। তাকে ভারি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখাচ্ছে। হঠাৎ আমরা সবাই দেখলাম তার তুষার ধবল জামার বাঁ দিকে বড়কের কাছে লাল কী যেন একটা ঝকঝক করছে। সেটা ইয়াং কমিউনিস্ট লীগের ব্যাজ। তখন পর্যন্ত আমরা শূদ্ধ দেখেছিলাম সেগেই কলস্কভকে ওরকম ব্যাজ পরতে, যিনি ছিলেন আমাদের পাইয়োনায়ার নেতা।

সম্ভবত সেগেইকেই আমরা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধা করতাম। ভর্তি হবার অনুষ্ঠানের সময় তিনিই আমাদের পাইয়োনায়ারের টাই এন্টে দিয়েছিলেন। তিনি আমাদের নিয়ে গিয়েছিলেন লেনিন সমাধি-মন্দিরে আর বিপ্লব মিউজিয়ামে। বড়ো লোকটি, যিনি জারের পদলিখ আর সৈন্যদের সঙ্গে ক্রাসনায় প্রেসনিয়ার শ্রমিকদের রক্তাক্ত যুদ্ধের কথা বলেছিলেন, তাঁকেও সেগেই এনেছিলেন আমাদের র্যালির সময়। আমাদের তিনি নিয়ে গিয়েছিলেন নতুন একটা পার্কে গাছ পোঁতার জন্য। তখন ব্যান্ড বেজেছিল। সংক্ষেপে সেগেই-ই আমাদের উঠনের বাইরেরকার বিরাট জগতের আভাস দিয়েছিলেন!.. আর এখন কি না সেগেইয়ের মতই একটা ব্যাজ ফেদিয়ার বৃদ্ধে ঝকঝক করছে।

আমরা একটু সরে ফেদিয়ার জন্য জায়গা করে দিলাম। কিন্তু সে বসল না। আমরা ভাবলাম তার নতুন “শয়তানের চামড়ার” পাংলুনটাকে সে বাঁচাচ্ছে। ব্যাজটার দিকে আমরা এক দৃষ্টে চুপচাপ তাকিয়ে রইলাম। তারপর এল দ্বিতীয় বিস্ময়টা— অলসভাবে পাংলুনের পকেটে হাত ঢুকিয়ে ফেদিয়া এক প্যাকেট “সাফো” বার করে আগুন ধরাল। এক মৃদু ধোঁয়া ছেড়ে বলল:

‘গতকাল ইয়াং কমিউনিস্ট লীগে যোগ দিয়েছি। এই দেখ আমার পার্টি কার্ড...’ দৃঢ়টো আঙুল দিয়ে একটা লাল কার্ড

বদ্বকপকেট থেকে আধখানা বার করে আবার সেটা পকেটের মধ্যে রেখে দিল।

‘একবার দেখতে দে তো,’ তানিয়া বলে উঠল। তার স্বরে অবিশ্বাসের স্দুর ফুটে উঠেছে।

কড়া স্দুরে ফেদিয়া বলল, ‘এটা দেখার জিনিস বা নাড়াচাড়া করার জিনিস না।’

‘ধরে নিলাম না হয় তুই তরুণ কমিউনিস্ট লীগে যোগ দিয়েছিস। তাহলে তোর কার্ডটা তরুণ কমিউনিস্ট লীগের, পার্টির কার্ড নয়,’ বলল তৎপর বরিয়া ইংসখকিন। খবরাখবর সম্বন্ধে তার জ্ঞান আশ্চর্য।

‘তফাৎটা কোথায়?’ শান্ত স্দুরে ফেদিয়া প্রশ্ন করল। ‘সব ব্যাপারেই তো ইয়াং কমিউনিস্ট লীগ পার্টিকে সাহায্য করেছে, তাই না?’

বরিয়া ইংসখকিন এর কোনো জবাব দিতে পারল না।

‘এটা আমার কথা নয়। কমরেড সেমাস্কোর নিজেরই কথা,’ ফেদিয়া যোগ করে দিল।

হাসিতে ফেটে পড়ল তানিয়া। তারপর একটা ছড়া কাটল। ছড়াটা সবাই আমরা খুব ভালো করে জানতাম:

কমরেড সেমাস্কোর কাছে

অনুন্নতি নিলাম —

মদের জন্য জামা-পাজামা বেচলাম,

তাইতে শেষ কর্দিটি খোয়ালাম।

এখানকার বাসিন্দাদের একজন মাতাল হলে সবসময়ই গাইত ঐ ছড়াটা। লোকটা ছিল অদ্ভুত ধরনের। দাগ তোলার ওষুধ সে বিক্রী করত।

নিরদ্বাপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ফেদিয়া তানিয়ার ছড়াটা শুনল।

সে বলল, ‘তুই মদুখ্য কি না বল? কমরেড সেমশ্‌কো যখন লেনিনের সঙ্গে কাজ করতেন তখন তো তুই জন্মাসই নি। কিন্তু এই সব কথা তোকে বলে লাভ কী?..’

‘তুই তাহলে কমরেড সেমশ্‌কোর সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়েছিছ,’ বিদ্রূপের সুরে বলল কলিয়া লাস্কির্ক।

‘হ্যাঁ, পাতিয়েছি,’ গুরুগম্ভীরভাবে বলে উঠল ফেদিয়া।

‘তাই নাকি!’ হাতে মদুখ লুকিয়ে হেসে উঠল কলিয়া।

‘দেখ, আর একজন মদুখ্যকে! জানিস, বাবা কার মোটরগাড়ি চালায়? কমরেড সেমশ্‌কোর গাড়ি। ষিনি জনগণের স্বাস্থ্য কমিসার। এবার বদুখলি তো?’

‘আমরা তা জানি,’ বরিয়া ইংস্‌থকিন বলল। ‘কিন্তু তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব তুই পাতালি কোথায়?’

ফেদিয়া খানিক থেমে ধোঁয়ার দুটো রিং ছেড়ে বলল:

‘গত রবিবার কমরেড সেমশ্‌কোর বাগান-বাড়িতে বাবা মোটর নিয়ে গিয়েছিল। আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল বাবা। আমরা পেরাঁছবার পর বাবা গেল খেতে। আমি থেকে গেলাম। হঠাৎ দেখি কমরেড সেমশ্‌কো আসছেন। তিনি প্রশ্ন

করলেন, “তুমি কে?” আমি বললাম, “আমার নাম ফিওদর, আপনার ড্রাইভারের ছেলে।” “বেশ ফিওদর, তুমি কী করো? পড়ছো?” “পড়াশুনোর সময় পরে পাব। এখন আমি কাজ করি, আমিও ড্রাইভার, একটা ভ্যান চালিয়ে দোকানে রুটি বিলি করি।” তিনি বললেন, “বেশ, বেশ। কিন্তু সেই সঙ্গে তোমার পড়াশুনো করা উচিত...” ফেদিয়া সিগারেটটাকে পা দিয়ে মাড়িয়ে দিল। স্পর্শই কথা বলতে সেটা তাকে বাধা দিচ্ছিল। ‘তারপর তিনি প্রশ্ন করলেন, “তুমি কি ইয়াং কমিউনিস্ট লীগে যোগ দিয়েছো?” আমি বললাম যে আমার দরখাস্তটা ব্যুরোতে মঞ্জুর করা হয়েছে। এখন আমাকে যেতে হবে সাধারণ সভায়। তিনি বললেন, “বেশ, বেশ, ইয়াং কমিউনিস্ট লীগ খুব শক্তিশালী। সব ব্যাপারেই পার্টির এটা ডান হাত। যখন তুমি সৎ আর কঠিন পরিশ্রমী লোক হয়ে উঠবে তখন যোগ দিতে পারবে পার্টিতে। তুমি হয়ে উঠবে একজন কমিউনিস্ট। পৃথিবীতে সেটা সবচেয়ে সম্মানজনক উপাধি।” শুনলি তো, গাধা কোথাকার। আর তুই ঐ কুৎসিত ছড়াটা কার্টিস, যেটাকে বানিয়েছিল পুরোনো আমলের ইতর লোকেরা।’

তানিয়া এমন ভাবে আকাশের দিকে তাকাল যেন কোনো কথা তার কানে যায়নি।

সাংবাদিক আমি। এই ভবঘুরে পেশার দরদ্র একবার আমায় যেতে হয়েছিল সাইবেরিয়ার এক বড় সহরে। দুসপ্তাহ

ধরে এলাকায় এলাকায় ঘুরে আমি আবার ফিরি এই সহরে।
প্রাদেশিক পার্টি কমিটির সেক্রেটারির সঙ্গে আলাপ আলোচনা
করা প্রয়োজন হয়ে উঠল। শরৎকালে এক বৃষ্টির দিনে পার্টি
কমিটির বাড়ির সামনে থেমে ভাবতে লাগলাম কী কী কারণে
সেক্রেটারির সঙ্গে আমার দেখা না হতে পারে — বৃন্দের
অধিবেশন, এলাকায় কোথাও কোনো সভায় তিনি হয়তো
গিয়েছেন, না কি তাঁর সেক্রেটারি সোজা বলে দেবেন, ‘কমরেড
পেত্রভ এখন ব্যস্ত।’

ঘ্যাঁচ করে ব্লেক কষে প্রবেশপথের সামনে ঝড়ঝড়ে একটা
মোটরগাড়ি থামল। অতি সাধারণ একটা বর্ষাতি পরে লাফিয়ে
নামল লম্বা একটি লোক। ড্রাইভারকে কয়েকটা কথা বলে সে
বাড়ির মধ্যে চলে গেল। গাড়িটা ঘড়ঘড় করে বৃষ্টির জমা
জলের উপর দিয়ে চলে গেল, পড়ে রইল একটা সোঁখীন
টায়ারের দাগ আর জলে মদুস্তা রঙের ছোপ।

আমার কপাল ভালো: বৃন্দের অধিবেশন ছিল না, কমরেড
পেত্রভ উপস্থিত। কিন্তু কী জানি কী কারণে আমার অনুরোধ
শুনে মনে হল তাঁর সেক্রেটারি যেন বিচলিত হয়ে উঠেছেন।
বেশ খানিকক্ষণ ধরে মনে হল মহিলাটি কী বিষয়ে যেন
মনস্কর করতে পারছেন না। আমার প্রেসের কার্ড থেকে তাঁর
দৃষ্টি চলে গেল জানালার দিকে। জানালার বাইরে একটা
গাঁটওলা মেপ্ল্ গাছ। শরতের দমকা বাতাস তার শেষ
পাতাগুলো ঝরিয়ে দিচ্ছে। তারপর তিনি গেলেন ভিতরে

আমার কার্ডটা নিয়ে। বেরিয়ে এসে স্লানমুখে আমাকে বললেন ভিতরে যেতে, তারপর আবার তাকালেন জানালার দিকে।

ভিতরে গিয়ে যে লোকটি টেবিলের সামনে বসেছিলেন তাঁর কাছে নিজের পরিচয় দিলাম। চিনতে পারলাম, এই লোকটিই সবে মোটরে করে এসেছেন।

‘আচ্ছা, সেনাপতি, কোন বাতাস এখানে তোমাকে উড়িয়ে এনেছে?’ তিনি বললেন।

‘নিশ্চয়ই শারদীয় বাতাস,’ অভ্যাসবলে উত্তর দিলাম।

দেশে অসংখ্য পেদ্রভ নামে লোক আছে! কিন্তু কে জানত এই সেই আমার ছেলেবেলাকার ফেদিয়া পেদ্রভ। রগের কাছে পাক-ধরা এই আত্মপ্রত্যয়ী লোকটির মধ্যে তাকে চিনতে পারতাম না। পরে লক্ষ্য করলাম কথা বলার সময় বাঁ চোখটা সে কোঁচকায়, যে ভাবে ফেদিয়া কোঁচকাত। ছেলেবেলার বন্ধুর সঙ্গে দেখা হওয়ায় খুঁসি হয়ে লাফিয়ে উঠে হাসতে হাসতে তাকে বললাম প্রবেশপথের সামনে দাঁড়িয়ে কী রকম ভাবছিলাম কী কী কারণে সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা হতে না পারে। সে চুপ করে রইল, স্পর্শটাই আমার কথাগুলো তার কানে যায়নি। একবারও সে হাসল না। (ক্ষুণ্ণ হয়ে ভাবলাম, “ব্যাপারটা তাহলে এই। এ দেখাছি আর একজন হোমরা-চোমরা লোক, গদিতে উঠে মাথা ঘুরে গেছে!..”)

সে বলল, ‘তোমার সঙ্গে আজ কথা কইতে পারব

না।' (আমি ভাবলাম, "ঠিকই হয়েছে। এ ধরনের লোক এভাবেই ব্যবহার করে।") অনেকক্ষণ চুপচাপ কাটল। সে ফাঁকা গলায় বলল, 'আমার মা মারা গেছে, আজ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।'

লজ্জায় আমার মুখ লাল হয়ে উঠল।

'আমার সঙ্গে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় তুমি কি আসবে?' সে প্রশ্ন করল। 'তাকে তো তুমি অনেকদিন ধরে চিনতে...' অস্পষ্ট হাসিতে তার ঠোঁটের কোণ কুঁচকে উঠেই সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে গেল। আবার তার মুখ হয়ে উঠল শান্ত, স্থির।

'নিশ্চয়ই যাব, ফিওদর...' আমি বললাম।

একটি মোটাসোটা লোক ঘরে ঢুকল। মাথায় তার টাক পড়তে শূন্য করেছিল। পরনে আধা-সামরিক পোশাক।

ঘরের মধ্যে এসে সঙ্গে সঙ্গে সে বলতে শূন্য করল, 'যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই। সেরেব্রিয়াকভ তার নতুন লাইনের ব্যবস্থায় ভুল করে বসেছে ... ফিওদর মাৎভেয়েভিচ, আপনি কি তার সঙ্গে কথা কইবেন...'

'আমার মা মারা গেছে,' তাকে বাধা দিয়ে বলল ফিওদর। 'আপনি সে কথা জানেন ... নিজেই আপনি সেরেব্রিয়াকভের সঙ্গে কথা বলুন...'

আমরা চুপচাপ বসে রইলাম। ফিওদরের মা-র চেহারাটা বার বার মনে করার চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু তাঁর গমগমে

গলা আর গাঁটওলা সৰ্বদা লাল হাত দুটো ছাড়া কিছুই মনে পড়ল না।

অন্ত্যেষ্ঠিক্রিয়া অতি সাধারণ। কফিনের পিছন পিছন চলল গদুটিবারো লোক। সবাই তারা কমিটির কর্মী। আমার আর ফিওদরের ঠিক পিছন পিছন ঘেঁষাঘেঁষি করে হাঁটতে লাগল তারা। সবচেয়ে পিছনে চলল ফিওদরের মোটরগাড়ি।

সবে-খোঁড়া কবরের পাশে নতজান্দু হয়ে বসে ফিওদর তার মার কপাল আর হাত চুম্বন করল। দাঁড়িয়ে উঠে মদুহুতের জন্য তাকাল মায়ের মদুখের দিকে। তারপর যে স্দুরে সৰ্বকিছু আদেশ দিচ্ছিল বোধ হয় ঠিক সেই স্দুরে বলল:

‘কফিনটা নামাও!..’

তখন চাপদাড়িওলা কবর-খুঁড়িয়ে বড়ো নিজের উপর দুশ-চিহ্ন এঁকে ফিওদরকে বলল:

‘প্রথমে আপনি কিছু মাটি ফেলুন... এটাই প্রথা...’

বাধ্যের মতো ফিওদর একমুঠো ভিজে মাটি তুলল, তারপর নীচের দিকে না তাকিয়ে সেটা ফেলল কবরে। সঙ্গে সঙ্গে কফিনের উপর পড়তে লাগল কোদাল ভর্তি ভর্তি ভিজে মাটির চাবড়া।

গোরস্থান ত্যাগ করে আমরা গেলাম ফিওদরের বাড়িতে।

‘আজ আর আপিসে যাব না,’ টেলিফোনের রিসিভারটা নামিয়ে সে বলল। ‘লোকজনের সঙ্গে আজ আর আমি চাই না।’

অনেকক্ষণ ধরে ফিওদর খাবার ঘরের আলমারির মধ্যে ডিশগুলো ঠুংঠাং করে গেলাশ খুঁজতে লাগল। গেলাশ খুঁজে না পেয়ে সে ভোদকা ঢালল চায়ের পেয়ালায়। স্পগটই বোঝা গেল গৃহস্থালীর ব্যাপার যার হাতে ছিল এখন আর সে নেই ... টেবিলের সামনে আমরা বসলাম। আমাদের মাঝখানে শেড-ঢাকা বাতির গোল আলোটা পড়েছে। এখন আর আমি মনে করতে পারছি না সেই বিকেলের পুরো আলোচনার কথাটা। আলোচনাটা ছিল অনির্দিষ্ট। মাঝে মাঝে আমরা কথা কইছিলাম। মাঝে মাঝে আমাদের মধ্যে কেউ একটা কথা শেষ না করেই যাচ্ছিলাম থেমে, তারপর আমরা বসে থাকছিলাম চুপচাপ। সেই ধরনের আলোচনায় বিরতিগুলো হল সক্রিয় অঙ্গ। যা কথাবার্তা হয়েছিল তার কিছুটা মনে আছে। যেমন মনে পড়েছে সেই ভাবেই লিখছি।

‘দেখতেই পাচ্ছে দুটো অর্ডার আমাকে দেওয়া হয়...’ ফিতেগুলোর দিকে তাকিয়ে সে বলল। ‘অন্তত একটা অর্ডার নিশ্চয়ই তার প্রাপ্য...’

একাধিকবার ফিওদর বলতে শুরু করল তার জীবনের কাহিনী। পুরো কাহিনীটি হয়নি কিন্তু। এইটুকু শ্রদ্ধ আমার মনে আছে।

‘একবছর ধরে একটা ভ্যান চালাবার পর মা আমার পেছনে ঘ্যানঘ্যান করতে থাকে ... মা বলে, “যে কারখানায় গাড়ি তৈরি হয় সেখানে যা। সেখানকার লোকেরা বুদ্ধিমান...” তাই আমি

সেখানে যাই। তারপর মা আমাকে লেখা-পড়া করতে শদ্রুদ করার ... যেদিন পার্টিতে যোগ দিই সেদিন মা এমন কি আমার বাবাকেও ডেকে পাঠায়।

‘তোমায় বলছি, ব্যাপারটা সহজ হয়নি ... আমি ইঞ্জিনিয়ার হয়ে উঠি, কিন্তু চলে আসি পার্টির কাজে ... কেন? .. একবার, তখনও আমি ইয়াং কমিউনিস্ট লীগের সভ্য, হোমরা-চোমরা একজনের সঙ্গে আমার কথা হয়। অনেকদিন ধরে তিনি কমিউনিস্ট।’

‘সেমাস্কোর সঙ্গে?’

‘হ্যাঁ,’ অবাক হয়ে গেল ফিওদর। ‘কী করে জানলে?’

‘তুমি নিজেই সে কথা আমাদের বলেছিলেন।’

‘বলেছিলাম নাকি? আর নিশ্চয়ই বড়াই করেছিলাম, তাই না? হ্যাঁ... ঠিক, ঠিক। পার্টির কর্মচারী হয়ে কত কাজই না করেছি?! বহু ধরনের কাজই করেছি — মেশিন ট্রাক্টর স্টেশান আর গ্রাম্য পার্টি কমিটি থেকে এক রেল আপিসের রাজনৈতিক বিভাগে পর্যন্ত... আর সবসময় মা যেত আমার সঙ্গে। যখনই কোনো নতুন জায়গায় যেতাম লোকেরা ভাবত পুরোনো জায়গা থেকে কী ধরনের “লেজুড” নিয়ে আসব। কিন্তু প্রতিবারই এক ব্যাপার ঘটত, শদ্রুদ আসত মা ...

‘যাদের মা আছে তাদের বরাতটা খুব ভালো ... তার সঙ্গে আমি কাজের কথা আলোচনা করতাম ... হাসছো? আমি কিন্তু তা করতাম আর উপদেশ পেতাম। একবার মনে পড়েছে কোন

বদ্যুরোতে এক যৌথখামারের সভাপতি আসে। লোকটা চমৎকার, কিন্তু ফ্রণ্টে তার ছেলের মৃত্যুর পর দারুণ মদ খেতে শুরুর করে। ফলে যৌথখামারের অবনতি ঘটে। পার্টি থেকে তাকে আমরা তাড়িয়ে দিয়েছিলাম ... বাড়ি ফিরে মাকে সব কথা বলি। তার জন্য মা আমাকে বকে ... ওঃ, কত আর বলব?!

‘দু বছর আগে মা-র নিউমোনিয়া হয়। যায়-যায় অবস্থা ... দু দিন দু রাত ধরে আমি তার বিছানার পাশে, ডাক্তারদেরও রাখি সেখানে। ডাক্তারদের যখনই জিগগেস করি তারা শুরুর কাঁধ ঝাঁকায়। কিন্তু সেবার মা-কে আমরা বাঁচিয়েছিলাম। এবার কিন্তু ক্যানসার হয় ... যাই বলো না কেন, আমাদের আসল সমস্যা হল ডাক্তারি।

‘...এই সব শুরুর হয় আমরা যখন স্পিরিটনভ্‌কায় ছিলাম তখন ... তোমার মনে আছে সেই লজ্জাকর মারামারির কথাটা? যার পর থেকে আমি দল ছেড়ে চলে যাই?... রাতে ঘুম ভেঙে যেতে দেখি মা খুঁট খুঁট করে রান্নাঘরে কাপড় কাচছে ... রাতদিন মা থাকত কাপড় কাচার টবের কাছে। বাবা আমাদের ছেড়ে চলে যাবার পর থেকে তার জীবনে কোনো অর্থই আর রইল না ... সেবারই প্রথম এ বিষয়ে আমি ভাবি ... আমি তার কথা ভাবছি যেন টের পেয়েই মা ঘরে ঢুকে আমার কাছে আসে ... চোখের তলায় তখনও কালশিটে পড়ে ছিল, তাই আমি ঘুমবার ভান করে রইলাম ... মা আমার ওপর ঝুঁকে পড়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, “আমার সাহসী ছেলে।” তারপর আবার

ফিরে যায় রান্নাঘরে কাপড় কাচতে ... তুমি বিশ্বাস করবে না, কিন্তু সে রাতে সমস্তক্ষণ আমি কাঁদি ... কেন জানি না ... মা-র জন্য কি আমার দ্বংখ হয়েছিল? তারপর হঠাৎ মনে হয়— বাঁদরামি ছাড়ার সময় হয়েছে, মা-র কথা মতো কাজ করা উচিত ... ভাবি, মা তো আমার কোনো ক্ষতি করতে চায় না?!

পাশের ঘরে জোরে ঘণ্টা বেজে ওঠায় অতীতের কথা মনে করতে তার বাধা পড়ল। ফিওদর গেল দরজা খুলতে। এসেছে বৃষ্টিতে ভিজে-যাওয়া তার সেক্রেটারি।

‘ফিওদর মাৎভেয়েভিচ, আপনার টেলিফোনটা খারাপ হয়ে গেছে,’ তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন মহিলাটি। ‘মস্কা থেকে আপনার একটা টেলিফোন এসেছিল ... তাঁরা বলেছেন আধঘণ্টার মধ্যে আবার আপনাকে টেলিফোন করবেন ... আপনি কি আসবেন?’

‘হ্যাঁ,’ নীচু গলায় কথাটা বলে ফিওদর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর শূন্য করল তার কোর্টটা পরতে।

সহরের ভিতর দিয়ে আমরা হেঁটে চললাম। রাত হওয়ায় সহরটা চুপচাপ হয়ে গেছে। ঠান্ডা বৃষ্টি চাবুকের মতো পড়তে লাগল আমাদের মুখে।

‘এর ওপর আবার আবহাওয়াটা জঘন্য ...’ পার্টি আপিসে যাবার পথে ফিওদর শূন্য এই কথাগুলো বলল।

অনাথ

আমার ছেলেবেলার বন্ধুদের পুরো জীবনধারার কথা আমি জুড়ে যেতে চাই না। দেখাতে চাই এক উঠনের ছেলেমেয়েদের নিয়তিতে ছিল জীবনে কী রকম উন্নতি ঘটে তার কথা। এই ভাবে উঁচুতে ওঠাটা আমাদের দেশেই শুদ্ধ সম্ভবপর।

শৈশবই হচ্ছে মানুষের জীবনযাত্রার দীর্ঘ পথের সূত্রপাত। শৈশবেই ছেলেরা শূদ্ধ করে জীবনকে জানতে। তখন তাদের হৃদয়টা থাকে সরল আর বিশ্বাসে ভরা, আর তাদের প্রতিক্রিয়াগুলো হয় অপক্ষপাতী। তখন তারা যা শেখে তার অধিকাংশই হয় স্থায়ী। তাই লোকের জীবনের অপরিহার্য অংশ হচ্ছে শৈশব। সেটা এমন কোনো গোলাপী কুয়াশা নয় যেটা কোনো দাগ না রেখে মিলিয়ে গেলে পর মানুষ জীবন শূদ্ধ করে মানুষ হয়ে ওঠে। না, শিশুর ধারণা আর অভিজ্ঞতা তাকে করে তোলে মানুষ। যাই হোক, আমার ছেলেবেলার বন্ধুদের — মস্কার সাধারণ উঠনের বাসিন্দাদের ভাগ্যের কথা বলে চলি।

মার্চ মাসের মস্কা। মাঝে মাঝে বৃষ্টি, মাঝে মাঝে বরফ। মাটি এখনো ঠাণ্ডা আর জমা। ইস্কুলটা সামান্য দূরে, কিন্তু তবু জানদুয়ারী মাসের চেয়ে বেশি ঠাণ্ডা হয়ে যায় পা। খুঁসর ভিজে বরফ ছপছপ করে লোকেরা চলেছে। মোটরগাড়ির টায়ার থেকে ছিটকে পড়ছে ময়লা জল। বাড়ির কার্ণিশে কার্ণিশে ভিজে চড়ুইগুলো স্থির হয়ে বসে আছে।

এখনকার মতোই কুড়ি বছর আগেকার মস্কোর মার্চ মাসও প্রায় একই রকম ছিল। সেটা বদলায়নি।

ওরকম নিরানন্দ আবহাওয়া যদি রবিবারে হয় তাহলে সেটা ভারি দুঃখের কথা। বেরতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু একা বাড়িতে থাকতেও খুব খারাপ লাগে। আমরা জমা হতাম আমাদের সিঁড়িতে। অবশ্য এখানে বিশেষ ইন্টারেস্টিং কিছু ঘটেনি, কিন্তু তবু ... যেমন ধরা যাক, ছ'তলা থেকে সিঁড়ির মাঝখানের ফাঁকা জায়গা দিয়ে থুথু ফেলতে আমাদের খুব ভালো লাগত। চাঁদমারি হিসেবে একেবারে নীচের তলায় আমরা রাখতাম একটা শাদা টালি। রেলিঙের ওপর দিয়ে সড়সড় করে নামতেও খুব মজা। ছ'তলায় একসঙ্গে দুটো ধাপ করে সিঁড়ি উঠতে চেষ্টা করে দেখেছো কি? সেটাও ইন্টারেস্টিং, কিন্তু মনে রেখো সোজা নয়। সবচেয়ে ফুর্তির ছিল দুহাত দিয়ে চেপে রেলিঙের ওপাশ দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওঠা। ঠিক পেছনেই হাঁ করে রয়েছে একটা গভীর গহ্বর। বাস্তবিকই আমাদের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠত সবচেয়ে উপরতলার রেলিঙের উপর চড়লে। মোট

কথা, বড়রা ধারে কাছে না থাকলে এমন কি সিঁড়িতেও করবার মত অনেক কিছু পাওয়া যেত ... কিন্তু একই সিঁড়িতে যখন বারোটা ফ্ল্যাট থাকে আর প্রতিটি ফ্ল্যাটে যখন থাকে তিনটে কি চারটে করে পরিবার তখন সবসময়ই কেউ না কেউ যাতায়াত করছে। কেউ না কেউ নিশ্চয়ই ধমকাবে। তাদের কাছ থেকে কত গালাগালিই না খেয়েছি আমরা! বড়দের সঙ্গে লড়াই করতে করতে ক্লান্ত হয়ে চুপচাপ গল্প করার জন্য আমরা সিঁড়িতে বসতাম। “তড়বড়ে তানিয়া” ধাঁধা জিগগেস করত:

‘এটা বল তো! কোন জিনিসটার চারদিকটা অন্ধকার আর মাঝখানে একটা গর্ত আছে?’

আগে থেকে আমরা জানতাম তার নিজের তৈরি ধাঁধাগুলোর কোনো উত্তর নেই। ধাঁধা বানাতেই তার সবচেয়ে ভালো লাগত, কিন্তু তার উত্তর দেওয়া নিয়ে সে কখনো মাথা ঘামাত না। কিন্তু কারো উত্তর যদি তার পছন্দ হত হাততালি দিয়ে বলে উঠত, “ঠিক ধরেছিস!” তারপর সঙ্গে সঙ্গে জিগগেস করত আর একটা ধাঁধা... এবার কিন্তু সবাই চুপ করে রইল। কলিয়া লাস্কি সর্বদাই একেবারে খাপছাড়া উত্তর দেয়। প্রথমে সেই উত্তর দিল।

‘চাকা!’ আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল সে।

‘চুপ কর, বোকা কোথাকার,’ তানিয়া তাকে ধমকে উঠল।

বরিয়া ইংসখিকিনের পাণ্ডিত্য নিয়ে অভিমান ছিল। পরিষ্কার করে বুদ্ধিতে চেষ্টা করত সে। চশমাটা ঠিক করতে

করতে (যেন সেটা তাকে ভাবতে সাহায্য করে) আর কানদুটো নাড়াতে নাড়াতে (সত্যি সে কান নাড়াতে পারত) বরিয়্যা প্রশ্ন করল:

‘সেটা কি একেবারে অন্ধকার না কি তার কিছুটা দেখা যায়?’

‘সেটা একেবারে অন্ধকার!’ যেন নিজেকে ভুলে সদূর করে বলে উঠল তানিয়া। আবার নিশ্চিন্ততা।

‘মনে হচ্ছে রাতের বেলার কুয়ো,’ সাবধানে বলল তানিয়া শ্বেচর্বাভ।

‘আমার তো তা মনে হয় না। তা নয়,’ বলে উঠল তানিয়া। ‘কুয়ো বৈকি!..’

বরিয়্যা ছাড়া আর সবাই হেসে উঠল। তখনও সে একমনে ভাবছে।

‘এটা রাত। পীচের মতো কালো,’ ভালিয়া আর্থিপভ বলল। তার স্বরটাকে শোনাল সহজ। ‘আর গর্তটা আকাশের চাঁদ।’

‘অবাক হয়ে তানিয়া তার দিকে তাকিয়ে নীচু গলায় বলল, ‘ঠিক। ঠিক ধরেছি...’

‘না, ওটা একেবারে ভুল!’ বরিয়্যা চেষ্টা করল তানিয়াকে যুক্তিটা শোনাতে। ‘দুটোর একটা হতেই হবে: হয় রাতটা একেবারে অন্ধকার, তাহলে সেখানে চাঁদ নেই। কিম্বা চাঁদ আছে অতএব রাতটা একেবারে অন্ধকর নয়। তোকে জিগগেস করিনি একেবারে অন্ধকার কী না। না, এটা একেবারে ভুল।’

উত্তেজিত হয়ে উঠে বরিয় চশমা খুলে আঙুল দিয়ে কাঁচগুলো পরিষ্কার করতে লাগল।

‘রাতের কথা তুই কী জানিস?’ তানিয়া তাকে খেঁকিয়ে উঠল। ‘আলো থাকতে থাকতেই তো তোর মা তোকে বিছানায় শুইয়ে দেয়। তাই তুই বরং চুপ করে থাক ...’

তবু বরিয়র বস্ত্রব্যটা ফেলনা নয়। কেউ কেউ তার পক্ষ নিল। শব্দ হয় গেল দারুণ তর্ক।

যখন খুব হৈ-চৈ হচ্ছে তখন আমাদের পিছন থেকে কে একজন চিঁচিঁ করে বলে উঠল:

‘কী খবর!’

আমরা ঘাড় ফিঁরিয়ে অবাক হয়ে গেলাম। উপরকার ধাপে একটা বড়সড় ছেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার গাল দুটো টকটকে গোলাপী। পরনে খাটো একটা ফারের কোট।

‘হাঁ করে তাকিয়ে দেখছিঁস কী?’ আবার সে চিঁচিঁ করে বলে উঠল। তাতে আমরা হাসিতে ফেটে পড়লাম। এতে অবাক হবার কিছু নেই—এরকম একটা বড়ো ধাড়ি ছেলে মাশার পোঁটা-নাকওলা ছোট ভায়ের মতো কিনা চিঁচিঁ করছে। সে কিন্তু একেবারেই ঘাবড়ে না গিয়ে একটা সিঁড়ির ধাপে বসে ধীরেসদৃশ্বে আমাদের একে একে ভালো করে দেখতে লাগল।

‘তুই কে?’ আমি তাকে প্রশ্ন করলাম। আমি দলের সর্দার। তাই আমার মনে হল এই অচেনা ছেলেটাকে আমার সনাক্ত করার চেষ্টা করা উচিত — কে জানে কত কী হতে পারে?

‘আমি ১৭ নম্বর ফ্ল্যাটে থাকতে এসেছি,’ চিঁচিঁ করে বলল সে।

‘তুই কে?’ আবার আমি প্রশ্ন করলাম।

‘আমি অনাথ ...’ তাতে আবার আমরা হাসিতে ফেটে পড়লাম। এই নাদদুস-নদুদুস লাল গালওলা ছোকরা যে অনাথ এটা ভাবতে গেলেই হাসিতে দম বন্ধ হয়ে আসে। কলিয়া লাস্কি লোকের পিছনে লাগতে ওস্তাদ। সে একটা অনাথ সম্পর্কে ছড়া কাটতে শুরুর করল। কিন্তু সেই অনাথ ভারি হাতে তার মাথায় একটা ঘুঁষি কষাতে সে চুপ করে গেল। ছেলেটা আবার চিঁচিঁ করে উঠল:

‘কেমন লাগল?’

‘ও ওটা হজম করতে পারে,’ ভালিয়া আর্থিপভ বলল। সে নিজেও অনাথ। নতুন ছেলেটাকে তার ভালো লেগেছে।

ছেলেরা হাসি থামাতে আমি আবার প্রশ্ন করতে শুরুর করলাম:

‘তোর নাম কী?’

‘তাতে তোর দরকার কী?’ দারুণ চটে উঠল অনাথ ছেলেটা। তার স্বরটা আরো চিঁচিঁ হয়ে উঠল, মুখটা হয়ে উঠল আরো লাল। ‘নিজেকে তুই মনে করিস কী? বাড়ির ম্যানেজার?’

‘ও বাড়ির ম্যানেজারই হোক আর নাই হোক তুই উত্তর দে,’ ভারি সুরু বলল ভালিয়া আর্থিপভ।

অনাথ ছেলেটা তাচ্ছিল্য ভরা দৃষ্টিতে তাকে ভালো করে দেখে নিল, কিন্তু বলল তার নাম সাভেল।

ছেলেটা বাজে কথা বলেনি, পরে আমরা তা জেনেছিলাম। সাভেল সালাজুকভ সত্যিই অনাথ। ১৭ নং ফ্ল্যাটে সে থাকত ইভান আলেক্সেয়ভিচ ব্দুমিনের সঙ্গে।

কুড়ি বছর পরে ইভান আলেক্সেয়ভিচ ব্দুমিনের সঙ্গে আমাদের আবার দেখা হবে। তাই কয়েক কথায় জানিয়ে রাখি তখন তিনি কী রকম ছিলেন... তখন তাঁর বয়েস হবে প্রায় পঞ্চাশ। লোকটি লম্বা, রোগা, খুব ফুতিবাজ। প্রায়ই তিনি আমাদের সঙ্গে গল্প করতেন, তানিয়ার চেয়েও কঠিন কঠিন ধাঁধা জিগগেস করতেন। একবার — সবে তখন বরফ গলতে শুরুর করেছে — আমরা একটা বরফের মূর্তি বানাচ্ছিলাম। আমাদের কাছে তিনি এসে বললেন:

‘তোমাদের মধ্যে কে আমায় বলতে পারে গ্রীষ্মকালের মাঝামাঝি পর্যন্ত কী করে বরফ রাখা যায়?’

আমাদের দিকে চোখ মটকে তিনি চলে গেলেন। ধাঁধাটা নিয়ে আমরা ভাবতে লাগলাম। অনেকক্ষণ ধরে আমরা খুব মাথা ঘামালাম। তারপর স্থির করলাম যে তাঁর ধাঁধাটাও তানিয়ারই মতো, শূন্য আরো কঠিন...

আমাদের ফ্ল্যাট-বাড়ির লিফ্টটা বরাবরই বিগড়ে থাকত। পাহারাউল তার মধ্যে রাখত ঝাঁটা আর কোদাল। একবার সেটার

কাছে দাঁড়িয়ে আমরা যখন সলাপরামর্শ করছি এমন সময় ইভান আলেক্সেয়েভিচ আমাদের কাছে এলেন।

তিনি বললেন, ‘তোমরা জানো এই লিফ্ট্‌টা বিপ্লবের আগে থেকে বিগড়ে রয়েছে, আর তার একমাত্র কারণ এর মোটরটা গিয়েছে পুড়ে?’ তার পরের কথাগুলো শোনার জন্য আমরা চুপচাপ রইলাম। তারপর তিনি হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলেন, ‘আমরা কি একটা হাতে-চালানো লিফ্ট্‌ বানাতে পারি না? কুয়োতে লোকে ষেরকম ব্যবহার করে দুটো কর্পিকল, দাঁড় আর চাকা... দাঁড়টা ধরে টানলে ড্রামটা ঘুরবে আর লিফ্ট্‌টা উঠবে ওপরে। এরকম করা সম্ভব বলে মনে হয় না?..’

‘নিশ্চয়ই করা যায়,’ বরিয়া ইংসখকিন তাঁকে ভরসা দিয়ে বলল।

বরিয়ার দিকে ইভান আলেক্সেয়েভিচ তাকালেন ধূর্ত দৃষ্টিতে।

‘করা যায় তাহলে, কিন্তু কথাটা হল জটিল কাজ সেটা...’ হেসে বলে তিনি চলে গেলেন।

আমার মনে আছে, লোকেরা বলত, বিপ্লবের আগে ইভান আলেক্সেয়েভিচ রামেনস্কয়ে কাপড়ের মিলে ইলেকট্রিক মিস্ট্রি ছিলেন। তারপর গৃহযুদ্ধের সময় তিনি লড়াই করেন। তাঁকে দেওয়া হয় “অর্ডার অফ দি রেড ব্যানার”। তিনি আহত হন। যুদ্ধ শেষ হবার পর তিনি মস্কোতে আসেন। তারপর থেকে বরাবর ছিলেন আমাদের ফ্ল্যাট-বাড়িতে। তাঁর কেউ ছিল না।

কেউই ঠিক জানত না জীবিকা উপার্জনের জন্য কী তিনি করতেন। পড়শীরা তাঁকে বলত পাগল। আমার বাবা একবার বলেছিলেন তিনি *perpetuum mobile* আবিষ্কারের চরম উদাহরণ—হয় মানুষটার কপাল খুব খারাপ, নয়তো সামান্য পাগলাটে ধরনের... কিন্তু এক সন্ধ্যায় রাতের খাবার খেতে খেতে বাবা “রাবচায়া গাজেতা” পড়তে পড়তে চেঁচিয়ে উঠলেন:

‘কী আশ্চর্য! আমাদের বর্মিনের কথা যে খবরের কাগজের শিরোনামায় উঠেছে!’ তাঁর লেখা একটি প্রবন্ধ বাবা চেঁচিয়ে পড়লেন। তার মধ্যে আমি এইটুকুই শব্দ বদ্বতে পারলাম যে ইভান বর্মিন কয়েকজন লোকের বিরুদ্ধে তাঁর অনুযোজ্ঞা জানিয়েছেন কী একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তাঁকে তারা সাহায্য না করায়। এই লোকদের তিনি বলেছিলেন বদ্যোরোহণাট।

রামেনস্কয়ে কাপড়-মিলে সাভেলির বাবার সঙ্গে তিনি একসঙ্গে কাজ করতেন। তখন থেকে তাদের সঙ্গে এঁর বন্ধুত্ব। অনাথ ছেলেটার অভিভাবকত্ব তিনি নিয়েছেন।

১৭ নং ফ্ল্যাটে সাভেলি থাকায় ইভান বর্মিনের ঘরে আমরা যেতে পারতাম। সেখানে প্রথম পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি বদ্বতে পারি যে ইভান বর্মিন একেবারেই অকৃতী বা পাগলাটে ধরনের লোক নন, বিরাট ফ্ল্যাট-বাড়িটার মধ্যে সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং আর গুণী লোক তিনি। বাবার বিচারের অভ্রান্ততা সম্বন্ধে সেই প্রথম বোধহয় আমার সন্দেহ জাগে। ঘরটা বোঝাই ছিল নানা ধরনের বিস্ময়কর জিনিসে। একটা ইলেকট্রিক মোটর

ছিল। সদুইচ টিপলে সেটা রাগি জন্তুর মতো গর্জন করত। সেখান থেকে একটা বেল্ট চলে গিয়েছে এক লেদ-যন্ত্রে। তার চারপাশে প্রচুর ধাতুর চাঁচুনি। লেদের উপরকার প্যানেলে বকবক করছিল নানা মাপার যন্ত্রের কাঁচগ্দুলো। অদ্ভুত দেখতে নানা নক্সা আর ব্লু-প্রিন্ট দেয়ালে ঝুলছিল। একটা সেল্ফে ছিল নানা ধরনের যন্ত্রপাতি। আর একটা সেল্ফে নানা রেটর্ট আর টেষ্টটিউব। তাদের মধ্যে নানা রঙের তরল পদার্থ। এসব ছাড়াও জানলার কাঁচশে ছিল একটা পাখীর খাঁচা। তার মধ্যে জ্যাস্ত একটা স্টার্লিং পাখী। আরো আশ্চর্যের ব্যাপার প্রায় সাভেলির মতো গলাতেই পাখীটা বলতে পারত ‘হ্যাঁ’, ‘না’, আর ‘খুব ভালো’। সেই স্টার্লিং পাখীটার কাছে বরিয়া ইংসখকিনের বাবার ঘড়ির মধ্যকার নড়বড়ে কোকিলটার কোনো তুলনাই হয় না।

এইখানে থাকত সেই অনাথ। অনাথ বৈকি! ঐ ষাদুভরা ঘরে থাকার জন্য আমাদের মধ্যে যে কেউই তার সবচেয়ে প্রিয় জিনিসটা দিয়ে দিতে ছিল প্রস্তুত! পিয়োন নিয়মিতভাবে সরকারের কাছ থেকে তার জন্য টাকা নিয়ে আসে, সপ্তাহে সপ্তাহে ইস্কুল, সহরের শিক্ষা কতৃপক্ষ আর অভিভাবক পরিষদের লোকেরা তার সঙ্গে আসেন দেখা করতে — এ আবার কী ধরনের অনাথ অবস্থা? তাছাড়া ইভান বর্দুর্মিন সাভেলির সঙ্গে এমন ব্যবহার করতেন যেন সে তাঁর নিজের ছেলে। এর ওপর আবার সাভেলি অল্‌পিদিনের মধ্যে নিজেই রোজগার করতে

শুধু করে দেয়। অভিভাবকের সঙ্গে সে একটা কাজ বাড়িতে করতে শুধু করল।

অল্পদিনের মধ্যেই সাভেল আমাদের একজন হয়ে উঠল। সে কিন্তু কখনো পাশের উঠনের ছেলেদের সঙ্গে আমাদের মারামারিতে যোগ দিত না। এতে আমরা অবাক হতাম। তার গায়ে যা জোর তাতে আমাদের মধ্যে সে হতে পারত সবচেয়ে বড় লাড়িয়ে। কিন্তু সেকথায় কখনো সে কান দিত না। তার যে কারণটা দেখাত সেটা ভারি হাস্যকর।

সে বলত, ‘আমার নাকটা খুব দুর্বল। সামান্য ধাক্কা লাগলেই সারা দিন ধরে হুড়হুড় করে রক্ত পড়ে...’

আমরা ভেবেছিলাম এটা একটা বাজে কথা। কিন্তু তার কথা নিয়ে কখনো ঠাট্টা করিনি। কেন জানি না তাকে আমরা শ্রদ্ধা করতাম। এমন কি তানিয়াও তার ধারালো জিভটা সামলে রাখত। কলিয়া লাস্কি লাগত সবাইকার পিছনে। প্রথম দেখা হবার পর তারও যথেষ্ট শিক্ষা হয়ে গিয়েছিল।

তাছাড়া তার দেখা খুব বেশি আমরা পেতাম না। কারণ সে ঘরের মধ্যে থাকত। তাতে অবাক হবার কিছু নেই। তার সেই ঘরের জীবনটা এত রোমাঞ্চকর যে বাইরে যাবার একেবারেই দরকার নেই। সে বেরিয়ে এলে আমরা তাকে ঘরে শুনতে চাইতাম ইভান বর্মিনের কোনো নতুন আবিষ্কারের কথা। একটা আবিষ্কারের কথা এখনো আমার মনে আছে। সেটা পারিবারিক জল খরচের একটা মিটার...

সাভেলির সঙ্গে জড়িত এই ঘটনাটার কথা মনে পড়ছে।

গ্রীষ্মকালে সপ্তাহে একবার উঠনে ফেদিয়া পেদ্রভের মা-র কাচা কাপড় সমেত দড়িগুলো আড়াআড়িভাবে গোঁজের সঙ্গে থাকত লাগানো। সে সব দিনে উঠনে যাওয়া আমাদের বারণ ছিল। ফেদিয়ার মা একটা টুল এনে ফটকে পাহারা দিত। আমরা কোনো দড়ি ছুঁয়ে ফেললেই পড়ে যেত দারুণ হৈ-চৈ, এ থেকে এমন কি বাড়িতেও রেহাই নেই।

সেদিন দড়ি খাটিয়ে কাচা কাপড়গুলো শুখতে দেবার পর হঠাৎ তার শরীর খারাপ হয়। সে চলে যায় ঘরের মধ্যে। দেখাশোনার ভার দিয়ে যায় ফেদিয়ার উপর, অর্থাৎ আমাদের সবাইকারই উপর। আর অদ্ভুত কাণ্ড: সেই কাচা কাপড়ের দায়িত্বটা আমরা অনুভব করার সঙ্গে সঙ্গে আর আমাদের ইচ্ছে করল না দড়িগুলো ধরে টানতে কিম্বা ভেজা চাদরগুলোর গোলকধাঁধার মধ্যে লুকোচুরি খেলতে। আমরা খুব সাবধানে পাহারা দিতে লাগলাম। অন্তত তাই আমাদের মনে হয়েছিল। আমরা আন্তরিকভাবে চাইছিলাম কেউ যেন কোনো কাচা কাপড় নিয়ে ছুটে পালাবার চেষ্টা করে। সন্ধ্যার মতো প্রবেশপথে অপরিচিত কেউ ঢুকলে আমরা লুকিয়ে পড়ে রুদ্ধ নিশ্বাসে লক্ষ্য করছিলাম তার গতিবিধি। ঘণ্টা দুই আমরা সাবধানে পাহারা দিই। শেষে ক্লান্ত হয়ে বেরিয়ে পড়ি রাস্তায়। ফেদিয়া থেকে যায়। রোদে তার মায়ের টুলটা টেনে এনে বসে একটা বইয়ের মধ্যে সে ডুবে যায়...

ঘাড়-নির্মাতা য়েভগেনি মার্কাভিচ ইংসখিকিনের দোকানের জানালাকার কোকিল-ঘাড়টা ভালো করে দেখে আমরা সাদভায়া স্ট্রীটের মোড়ে গিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি পীচ ঢালাই। তারপর যে কড়াগুলোয় পীচ ফোটানো হচ্ছিল সেখানকার দুর্গন্ধময় ধোঁয়ায় আমাদের গলা জ্বালা করে ওঠে। কিন্তু আমরা যখন যাব বলে স্থির করছি এমন সময় একটা ঘটনা ঘটল। তার ফলে সেখানে আমরা আরো খানিক থেকে গেলাম ...

ছেলের হাত ধরে সহরের চিড়িয়াখানা থেকে উকিল রমেইকো ফিরিছিল। আমাদের ফ্ল্যাট-বাড়ির সে বাসিন্দা। তার ছেলের নাম মিশা। ছেলেটা বাবু ধরনের। দুচক্ষে তাকে আমরা দেখতে পারতাম না। তাদের দেখাচ্ছিল আদর্শ বাপ ছেলের মতো। পথের মোড়ে কিন্তু ছেলে তার বাপের হাত ছেড়ে আড়চোখে চারিদিকে তাকিয়ে সব-ঢালা পীচের ওপর দিয়ে ছুটে গেল। সেখানে পড়ল তার পায়ের গভীর ছাপ। এটা লক্ষ্য করে যারা রাস্তা সারাচ্ছিল তাদের একজন উকিলের ছেলেকে ধরে তার প্যাণ্টের পেছনে কয়েক ঘা কষিয়ে দিল। দারুণ হেঁচ-চৈ শব্দ করে দিল উকিল।

‘যে কোনো গুন্ডা আমাদের ছেলেদের যদি মারতে পারে তাহলে অবস্থাটা কী হয়ে দাঁড়াবে?..’ সে চেঁচিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে যেন মাটি ফুঁড়ে দর্শকের ভিড় জমে গেল। কী ঘটে দেখার জন্য আগ্রহে তারা অপেক্ষা করতে লাগল। ‘আমাদের

মিলিশিয়ার চোখ কোথায় পড়ে আছে?’ মিশার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে উকিল লাগল চেঁচাতে। নিশ্চুপ গলায় ছেলেটা লাগল আতঁনাদ করতে। ইতিমধ্যে যে লোকটা বাবু ছেলেকে শিক্ষা দিয়েছিল আবার সে কাজে ফিরে গেল, ফুটন্ত পীচটা লাগল নাড়াতে, যেন কিছুই ঘটেনি। খানিক চেঁচামেচি করে উকিল চলে গেল। তারা দু'জন আমাদের পাশ দিয়ে যাবার সময় পীচ ঢলাই-এর লোকটা ছেলেটাকে যেখানে চড় মেরেছিল সে জায়গাটা আমরা দেখিয়ে দিলাম। যেন বলতে চাইলাম, “কেমন লাগল রে?” বাবু ছেলেটা এমন ভাব দেখাল যেন বুঝতে পারেনি ...

তারপর আমরা গেলাম য়ের্মলায়েভস্কি গলিতে। কিন্তু সেখানে চিত্তাকর্ষক কিছু দেখতে পেলাম না।

‘চল, ফিরে গিয়ে আবার ডিটেকটিভ-ডিটেকটিভ খেলা যাক,’ তলিয়া শ্চের্বাকিভ প্রস্তাব করল। তানিয়া তার কথায় সায় দিল। আমরা ফিরে গেলাম।

ফটকের মধ্যে ঢুকতে যে দৃশ্য চোখে পড়ল তাতে দম বন্ধ হয়ে এল আমাদের। একটা রোগা লম্বা ছোকরা দড়ি থেকে হ্যাঁচকা টান মেরে চাদরগুলো খুলে ভরছিল একটা বস্তায়।

প্রথম সন্মিত ফিরে এল তলিয়া শ্চের্বাকিভের।

‘এই! কী করছো?’ ভাঙা গলায় সে চেঁচিয়ে উঠল। প্রশ্নটার উত্তরের কোনো দরকার ছিল না — ব্যাপারটা স্পষ্টই। চোরটা চমকে উঠে তাড়াতাড়ি ঘুরে দাঁড়াল। মাত্র কয়েকজন

ছেলেদে দেখে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে সে বস্তাটা তুলে নিয়ে ধীরে ধীরে এগুতে লাগল আমাদের দিকে। সেটা এক ভয়ঙ্কর মূহূর্ত। সোজা সে আসছে আমাদের দিকে। তার ঠোঁটে ফুটে উঠেছে ভয়ঙ্কর হাসি। তলিয়া শ্বেবাকভ ছিল সামনে। সে শূন্য করল পিছন হঠতে — তার গল্পের সাহসী ডিটেকটিভের সঙ্গে এর কোনো মিল নেই। শেষ পর্যন্ত কী ঘটত বলা কঠিন যদি না ফেদিয়া পেত্রভ সেই মূহূর্তে তার জায়গা থেকে বই হাতে ছুটে এসে চেষ্টা করে উঠত, “চোর, চোর, ধরো ধরো!” পিছন থেকে সে চোরটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। বইটা দিয়ে মারতে লাগল লোকটার মাথায়। বইটার নাম “ক্যাপ্টেন গ্রাণ্টের ছেলেমেয়ে”। বইটার মলাটে পুরো পাল-তোলা যুদ্ধ জাহাজের একটা জমকালো ছবি। তার হাতের সঙ্গে সঙ্গে সেটাও ওঠা নামা করতে লাগল। লোকটা ঘুরে দাঁড়িয়ে বস্তা দিয়ে মাথায় মেরে ফেদিয়াকে ফেলে দিল। সেটা কিন্তু চোরের ভুল — সে এক-উঠনের ছেলেদের মনস্তত্ত্বটা বোঝেনি। ফেদিয়াকে পড়ে যেতে দেখে খরগোস দেখলে একদল শিকারী কুকুর যে রকম ছুটে যায় আমরা সেই রকম ছুটে গেলাম চোরটার দিকে। এক মিনিটের মধ্যে তানিয়া উঠনের পিছনে ছুটে গেল বস্তাটা নিয়ে। আর আমাদের শরীরের চাপে চোরটা মাটিতে রইল চিৎপাত হয়ে পড়ে।

হৈ-টেকের কারণ জানবার জন্য অনেকে ছুটে এল বেরিয়ে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই লোকটার চারিদিকে জমে উঠল বড়সড় একটা ভিড়। চোরটা ম্লান দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকিয়ে রইল।

‘ওর হাত বেঁধে থানায় নিয়ে যাও!’

‘কিসের জন্য? ওকে আমরা এখানে এমন পেটাতে পারি যে খুব শীগ্গির সেকথা ও ভুলবে না!’

‘না, এরকম লোকের জেল হওয়া দরকার! সেখানে ওরা ওকে শেখাবে কী করে কাজ করতে হয়!’

‘আজকাল এরকম লোক অনেক হয়েছে! এদের গুলি করে মারা উচিত!’

চোরটার চেহারা করুণ হয়ে উঠেছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই দুন্দু চিৎকার থেমে গেল। সবাই তর্ক করতে শুরু করল কে একে থানায় নিয়ে যাবে।

তখন চোরটা দেখাল যে বাস্তবিকই সে খানিকটা লোকচরিত্র জানে। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে দেখে নিল যে তাকে ঘিরে রয়েছে শুদ্ধ স্ত্রীলোকেরা (তার কপাল ভালো, তাদের মধ্যে ফেদিয়ার মা ছিল না)। সে ভাবল অনুনয় বিনয় করে নারীচরিত্রের প্রসিদ্ধ অনুকম্পার উদ্বেক করবে। (আমাদের কথা সে ধর্তব্যের মধ্যেই আনল না।)

একঘেয়ে টানা টানা সুরে সে বলতে লাগল, ‘মা-রা! হতভাগা ছেলের ওপর দয়া করুন! আপনাদের কী ছেলেমেয়ে নেই? সত্যি বলছি এটা করতে বাধ্য হয়েছিলাম। চারদিন ধরে কিছু দাঁতে কাটিনি, কিছু না!..’

হায়, নারী হৃদয়!

‘আজ তোমাকে ছেড়ে দিলে কালকেই আবার চুরি করতে আসবে...’

‘ভগবানের দিবিয়া, কখনো আসব না! এলে ভগবান যেন আমার বিচার করেন! আমার দয়া করুন! আমার বাপ-মা নেই, পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যার কাছে যেতে পারি!..’

হঠাৎ কি জানি কোথা থেকে আমাদের সেই অনাথ ছেলে সাভেলি ভিড় ঠেলে সোজা এগিয়ে গেল চোরটার দিকে। তার বয়েস পনেরো। আর চোরটাকে মনে হচ্ছিল বছর আঠারোর। কিন্তু দৃষ্টিতেই তারা মাথায় মাথায়।

‘তুমি কী বললে? তুমি অনাথ?’ ফাঁকা গলায় প্রশ্ন করল সাভেলি।

‘হ্যাঁ, আমি অনাথ,’ দ্বিধাগ্রস্তভাবে সে ছোকরা বলল, এই নতুন শব্দের দিকে সে তাকাল উদ্ভিন্ন দৃষ্টিতে।

‘তুমি অনাথ, তাই না!’ প্রশ্ন করে সাভেলি সেই ছোকরার কানে মারল এক ঘা। চোরটা হাত তুলল, কিন্তু দক্ষভাবে সাভেলি হাত দুটো সরিয়ে দিয়ে আবার মারল তাকে।

‘অনাথ! কথাটা আবার বলো!’

‘আমি অনাথ নই!’ কেঁদে ফেলল চোরটা। ‘আমার মা হাসপাতালে, আর বাবা চলে গেছে!..’

‘তাহলে তুমি অনাথ নও?’ সাভেলি আবার মারল

চোরটাকে। ‘কাজ করার ইচ্ছে নেই, তাই না হতভাগা? আরামে থাকতে চাও, তাই না? এই নাও!..’

এ সবই এতো তাড়াতাড়ি ঘটে গেল যে আমাদের মধ্যে কেউই নড়তে চড়তে বা একটি কথা বলতে পারলাম না।

‘চলো, থানায় যাওয়া যাক!’ চোরটাকে সাভেলি ঠেলা দিল। স্ত্রীলোকরা তাকে ছেড়ে দিল পথ। সাভেলি আদেশ দিল, ‘তলিয়া, ভালিয়া, সাশা, ভাসিয়া, বস্তাটা নিয়ে আমাদের সঙ্গে আয়!’

চোরটাকে থানায় দিয়ে এসে আমরা বাড়ি ফিরছিলাম। আমাদের মনের মধ্যে ছিল নানা অস্পষ্ট পরস্পরবিরোধী অনুভূতি।

তলিয়া বলল, ‘আমার মনে হয় ওকে বেশ করে দু’চার ঘা দিয়ে ছেড়ে দিলেই হত!..’

সাভেলি চুপ করে রইল।

‘ওর মা যে হাসপাতালে সে কথাটা হয়তো সত্যি...’ বলল ভালিয়া।

‘আর সত্যিই হয়তো ওর বাবা ছেড়ে চলে গেছে...’ ফেদিয়া যোগ করে দিল। তার বাবাও নিজের পরিবারের সঙ্গে থাকত না।

সাভেলি চুপ করে রইল।

‘তাছাড়া আমরা তো সবকিছুই তার কাছ থেকে ফেরৎ পেয়েছি...’ আমি বললাম।

‘তোরা একদল গাধা,’ ফেটে পড়ল সাভেলি। ‘কেন তোরা বারবার বলছিঁস ওর বাপ-মা নেই? শিক্ষা কমিটিতে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে কোনো অনাথ আশ্রমে ব্যবস্থা ঠুঁরা করে দেবেন। ভালো খাবার, ভালো লেখাপড়া শেখার আর পরে চাকরির বন্দোবস্ত হয়ে যাবে। কী করে এই সব হয় আমার জানা আছে। উপযুক্ত লোকের হাতে পড়ার আগে আমাকে বহু অসুবিধের মধ্যে পড়তে হয়েছে। এখন কিন্তু ওর কপালে আছে শ্রম-শিবিরে যাওয়া — যতদিন না শোধরায় ততদিনের জন্য ...’ খানিকক্ষণ চুপচাপ সাভেলি হেঁটে চলল। কিন্তু ফটকের কাছে এসে সে যোগ করে দিল, ‘ওকে আমার মারা উচিত হয়নি। আমাকে ও দারুণ ক্ষেপিয়ে দিয়েছিল ...’

পরের দিনেও বাড়িতে ঘটনাটা নিয়ে আলোচনা চলল। প্রত্যেকেই মন্তব্য করল, কী করে এক অনাথ আর এক অন্যথকে মেরে তাকে নিয়ে এসেছে থানায়। ডিনারের সময় ঘটনাটা শুনলে আমার বাবা বললেন:

‘সাভেলি ছেলেটা একনিষ্ঠ ...’

বাবার কথাটার মানে আমি ঠিক ধরতে পারলাম না, কিন্তু মনে হয়েছিল যে সাভেলি ঠিকই করেছে।

কুড়ি বছর পরে যখন আমি সাভেলির খোঁজ করি তখন কী করে যে খোঁজ শূন্য করব তার কোনো উপায়ই জানা ছিল না। তানিয়া আর ভালেস্তিন শূন্য নিশ্চিতভাবে জানত যে সেই

চোরের ঘটনার পর সাভেলি আর তার অভিভাবক অন্য জায়গায় উঠে গিয়েছিল। তানিয়া বলেছিল তার মনে পড়ছে সাভেলি যেন বলেছিল কোনো কারখানা বাড়ির কথা...

আমি প্রথম চেষ্টা করলাম ইভান আলেক্সেয়েভিচ বর্দুর্মিনকে খুঁজে বার করতে। জানতাম না তিনি বেঁচে আছেন কি না। ঠিকানা দপ্তর সাতজন বর্দুর্মিনের খোঁজ আমায় দেয়। তাদের নামের আদ্যাক্ষরগুলো একই। চার জায়গায় আমি অনর্থক ঘুরি।

এখন চলছি পঞ্চম ঠিকানায়। গোর্কি স্ট্রীটে এটা নতুন এক ফ্ল্যাট-বাড়ি। বাড়ির ম্যানেজারের আপিসে খোঁজ করলাম। হ্যাঁ, অধ্যাপক ই. আ. বর্দুর্মিন, ডি. এস্‌সি., সেখানে থাকেন — আমাকে তারা জানাল। কিন্তু সাভেলি সালাজ্‌কভ নামে তো কেউ থাকে না।

তেতলা। বোতামটা টিপলাম। তুলোর গদি-মোড়া দরজাটা খুলে গেল।

‘প্রফেসর বর্দুর্মিনের সঙ্গে কি দেখা করতে পারি?’

স্ট্রীলোকটির চেহারা দেখে মনে হল সে বাড়ির চাকরাণী। আমার আপাদমস্তক সে দেখে নিল।

‘কী দরকার?’

‘ব্যক্তিগত দরকার...’

‘আপনার কি দেখা করার কথা ছিল?’

‘হ্যাঁ,’ আমি মিথ্যে বললাম।

আমাকে সে ঢুকতে দিল। পাশের ঘর থেকে ভেসে এল দুটি কণ্ঠস্বর — একটি স্ত্রীলোকের আর একটি পুরুষের খ্যাঁসখেঁসে গলা। একটি দরজা খুলে গেল, যে মানুষটিকে খুঁজছিলাম তিনি এলেন ঘরে। চুল পেকে গেছে, কিন্তু আগের মতোই কর্মঠ। সংক্ষেপে বলতে গেলে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে আমি চিনতে পারলাম। আমার দিকে ভুরু কুঁচকে অসহিষ্ণু দৃষ্টিতে তিনি তাকালেন।

‘প্রফেসর, আপনাকে বিরক্ত করার জন্য ক্ষমা করবেন। আমি লেখক আর ...’

‘সম্পাদকমণ্ডলী থেকে এসেছেন কি?’ সতর্কভাবে প্রশ্ন করলেন ব্লুমিং।

‘না ... দয়া করে বলুন কখনো কি আপনি স্পিরিডনভকা স্ট্রীটে থাকতেন? আসলে আমি সাভেল সালাজুকভের খোঁজ করতে এসেছি ...’

‘সাভেল?’ কথাটা অধ্যাপক চেঁচিয়ে বলে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। ‘ভেতরে আসুন, ভেতরে আসুন ... আমি ভেবেছিলাম প্রবন্ধটার জন্য ব্লুমিং আপনাকে পাঠানো হয়েছে। প্রবন্ধটা এখনো শেষ হয়নি ...’

আমরা পড়ার ঘরে বসলাম। চমৎকার সাজানো ঘরটা। তবু স্পিরিডনভকার সেই যাদুময় ঘরের সঙ্গে কেমন যেন তার মিল আছে।

‘আপনি তাহলে ভেবেছেন আপনার ছেলেবেলার বন্ধুদের

কথা লিখবেন? চমৎকার পরিকল্পনা। বাস্তবিকই চমৎকার...’
আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বৃদ্ধিমান বলতে লাগলেন।
‘কিন্তু আপনাকে মনে করতে পারছি না ... দেখতে আপনি কেমন
ছিলেন?... চুলটা কি সামান্য লালচে ছিল?’

‘না। সে হল ভালিয়া আর্থিপভ।’

‘আপনাকে তাহলে দেখতে কেমন ছিল?’

‘প্রফেসর, সে কথা বলা কঠিন।’

‘যাক গে, যাক সে কথা... সাভেলির কথা বলি। ঐ যে ও
ওখানে!’ তাঁর ডেস্কের উপরকার বড় একটা ফটোর দিকে
তিনি আঙুল দিয়ে দেখালেন। ‘ঐ ও! লেফটেন্যান্ট-কর্ণেল
সাহসী সাভেলি সালাজুকভ। বিমান বাহিনীতে রয়েছে।
“হিরো অফ দি সোভিয়েত ইউনিয়ন!”’

‘সত্যি নাকি!’

‘এতে এতো আশ্চর্য হবার কী আছে? আপনি লেখক
হয়েছেন, সে হয়েছে পাইলট। আর হবে না-ই-বা কেন?
তাছাড়া এমন কি স্পিরিটনভকায় থাকার সময় থেকেই বিমান
চালানোর দিকে তার ভারি ঝোঁক ছিল... ইচ্ছে থাকলেই উপায়
হয়। যেমন ধরুন আমার কথা। পঞ্চাশ বছর বয়েসে আমি স্থির
করি কোনো টেকনিক্যাল কলেজের ডিগ্রী নেব। ডিগ্রীটা আমি
পেয়েছিলাম। এখন অন্যদের পড়াই আমি। হ্যাঁ, ইচ্ছেটা খুব
জোরালো হওয়া দরকার। তাহলেই সেটা সফল হবে। এতে
কোনো ভুল নেই!’

সাভেল সালাজ্জকভ দূর প্রাচ্যে কাজ করছে। তার কয়েকটা চিঠি অধ্যাপক বর্মিন আমাকে দেখালেন। প্রত্যেকটা চিঠি একইভাবে শুরু হয়েছে:

‘প্রিয় পাতানো বাবা, আপনার পাতানো ছেলে লিখছে...’

একটা চিঠিতে সাভেল জানিয়েছে যে তার স্ত্রী ছেলেদের খুব বেশি আদর দিচ্ছে। তার ফল এই দাঁড়িয়েছে যে ইস্কুলে তারা যতটা ভালো করতে পারত ততটা করছে না। ইভান আলেক্সেয়েভিচকে সে অনুরোধ করেছে তার বড় ছেলেকে (পাতানো নাতিকে) যেন ‘একটা বিশেষ কড়া চিঠি দেন ...’ আর একটা চিঠিকে দেখাল — একটা retractable landing gear-এর সংক্ষিপ্ত দ্রুটি-পত্রের মতো। ইভান আলেক্সেয়েভিচকে সাভেল অনুরোধ জানিয়েছে যে ‘তিনি কি ডিজাইনারের সঙ্গে দেখা করে তাকে ভুলটা সংশোধন করার সাহায্য করতে পারেন?’ আর একটা চিঠিতে সে দিয়েছে উস্‌সুর্নির এক বাঘ শিকারের বিশদ বর্ণনা। শেষ পর্যন্ত ‘দুটো দিন আর দুটো রাত মাঠে মারা যায়, আর বাঘেরা কিন্তু থাকে বেঁচে ...’

সাভেলকে আমি একটা চিঠি লিখলাম। চিঠিটা বেশ বড়, কারণ নিজেকে আর অন্যান্য ছেলেদের তাকে মনে পড়িয়ে দিতে হল। ছেলেবেলাকার কয়েকটি স্মরণীয় ঘটনার বর্ণনা দেওয়া ছাড়া সেটা করার অন্য কোনো উপায় ছিল না ... এক মাস পরে উত্তর পাই। সামান্য সংক্ষিপ্ত করে সেটা এখানে দিলাম।

‘অভিবাদন গ্রহণ করুণ! কিন্তু কিছুতেই আপনাকে মনে করতে পারছি না। আর্থ’পভ আর তানিয়াকে মনে আছে (তাদের কথা জেনে খুঁসি হলাম। চমৎকার লোক গুঁরা!) পামিরে তলিয়া শ্চের্বাকভের যতদিন না মৃত্যু হয় ততদিন তার সঙ্গে আমার চিঠির আদান প্রদান ছিল। আপনি নিশ্চয়ই জানেন সে ছিল পাহাড়চাড়িয়ে। কিন্তু যতই জোর করে ভাবি না কেন কিছুতেই আপনাকে মনে করতে পারছি না। ইভান আলেক্সেয়েভিচ তাঁর চিঠিতে লিখেছেন তাঁর সঙ্গে আপনার দেখা করার কথা। তিনি জানিয়েছেন যে আপনাকে তিনি চিনতে পেরেছেন। তাঁর কথা আমি বিশ্বাস করি না। আপনারও বিশ্বাস করা উচিত নয়। বহু বছর আগে যে স্মৃতে তিনি প্যাঁচ দিয়েছিলেন সেটার কথা তিনি মনে করতে পারেন, কিন্তু মানুষকে মোটেই নয়। শূন্য তাঁর সঙ্গে কাজ করবার সৌভাগ্য যাদের হয়েছিল তাদের ছাড়া।

‘কিন্তু, দোহাই আপনার, রাগ করবেন না। সত্যি বলতে কি “স্পিরিটনভকা যুগের” সমস্ত কথা আমার খুব অস্পষ্ট মনে পড়ে, যেন সেখানে যে চার বছর কাটাই সেটা হারিয়ে গেছে কুয়াশার মধ্যে। এর কারণ জানি না। আসলে সেখানেই তো শূন্য হয়েছিল আমার দ্বিতীয় জীবন। তবু ব্যাপারটা এই... আপনার চিঠি পড়ার পর চোরের ঘটনাটা আমার খুব স্পষ্ট মনে পড়ছে, যেন সেটা গতকালই ঘটেছিল... একটা আকস্মিক আর অত্যন্ত করুণ ব্যাপার সেই ঘটনার উপর মস্তবড় প্রভাব বিস্তার করে। স্পিরিটনভকায় আসার একবছর আগে বাবা-মাকে আমি

হারাই। পুরো বছরটা নানা জায়গায় ঘুরি, জীবিকা উপায় করি চুরি করে। একদল কিশোর চোরের আমি ছিলাম সর্দারের মতো। আমরা মালাখভ্কা, উদেল্‌নায়া, বিকভো, রামেনস্কে পর্যন্ত জায়গার গ্রীষ্মকালের বাসিন্দাদের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিলাম। একবার আমরা এক গ্রীষ্মবাসের দরজা ভেঙে ঢুকি। বাড়িটার ছাদ ছিল মজবুত লোহার। দেখে মনে হয়েছিল বাড়িটা বেশ শাঁসালো গোছের। কিন্তু কী একটা ভুল হয়ে যায়। বাড়ির মালিক আমায় ধরে ফেলেন। তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, পদার্থবিদ। গত বছর তিনি মারা গেছেন। খবরের কাগজে যখন তাঁর মৃত্যু সম্বন্ধে প্রবন্ধটি পড়ি তখন এমন ভাবে কাঁদি যেন তিনিই ছিলেন আমার বাবা (তাহলে দেখছেন তো আমার অন্তত তিনজন বাবা) ... তিনি আমাকে ধরে তাঁর পড়ার ঘরে টেনে নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে সবকথা শুনতে চান।

‘আমি অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে সব কথা বলিনি। স্পিরিটনভকার সেই চোরের মতোই দ্রুতগত নাকে কাঁদি। কিন্তু সেই বৃদ্ধ ছিলেন চালাক। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমাকে কথা কওয়াতে শুরুর করেন। গড়গড় করে আমি বলে যাই যতক্ষণ না তিনি জানতে পারেন আমার সবকথা... প্রায় ভোর পর্যন্ত আমরা কথা বলি। বারবার জোর দিয়ে তিনি বোঝাতে চান যে আমাদের দেশে প্রত্যেক অনাথ যা চায় তাই পেতে পারে। সকালে তিনি রামেনস্কে মিলের পার্টি সেক্রেটারির কাছে একটা চিঠি লেখেন

আর আমাকে দেন একটা দশ রুবল নোট। চিঠিটা ছিল সংক্ষিপ্ত, অনেকটা এই ধরনের: “আপনার পুরোনো শ্রমিক কমরেড সালাজ্জিকভের ছেলের দেখাশোনা করেন না বলে আমি আশ্চর্য হয়েছি।” আর কিছ্‌ না। তিনি বলেন মিল থেকে আমায় যদি সাহায্য না করে তাহলে আমায় তাঁর কাছে ফিরে যেতে। পার্টি সেক্রেটারির সঙ্গে আমি দেখা করি খুব সকালে। চিঠিটা পড়ে তিনি আমাকে ভীষণ বকাবকি করতে শুরু করলেন ... জানা যায় পুরো বছরটা নানা জায়গায় তাঁরা আমার খোঁজ করেছিলেন। তারপর তিনি মস্কায় ইভান অলেক্সেয়ভিচ ব্দুমিনকে এক টেলিগ্রাম করেন। দেখা যায় তিনিও আমার খোঁজ করছিলেন, কারণ মৃত্যু-শয্যায় আমার বাবার কাছে তিনি কথা দিয়েছিলেন যে আমার দেখাশোনা করবেন। তারপর সেক্রেটারি আমাকে নিয়ে যান কল্যাণ কর্মিটির কাছে। সেখান থেকে আমার পুরো বছরের পাওনা ভাতা পাই। একসঙ্গে এতো টাকা আগে কখনো পাইনি। সমস্ত দিন ধরে সেক্রেটারি আমাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। “ব্দুমিন যদি উত্তর না দেন তাহলে আমরাই সবকিছ্‌ ব্যবস্থা করব। মিলের ইস্কুলে তুমি শিক্ষা পাবে। তোমার বাবার মতোই ভালো শ্রমিক হয়ে উঠবে,” আমায় তিনি বলেন। পার্টি আপিসে সে রাতে আমার থাকার ব্যবস্থা হয়। পরের দিন খুব সকালে ব্দুমিন সেখানে আসেন আমায় মস্কায়, আপনাদের ওখানে স্পিরিটনভকায় নিয়ে যেতে ... চার বছর ধরে আমার লেখাপড়া আর কারিগরি শিক্ষার তদারক তিনি

নিজে করেন। তারপর দুজনেই আমরা যাই এক কারখানায়। সেখানে ছিল একটা টেকনিক্যাল কলেজ। আমরা দুজনেই সেই কলেজে ভর্তি হই। লোকেরা আমাদের বলত “পাইয়োনায়ার আর তার বন্ধু পেন্‌শনিয়ার”। একবছর পরে আমি এক বৈমানিক ক্লাবে ভর্তি হই। আর একবছর পরে শুরুর করি বিমান চালাতে। তারপর সবকিছু ছেড়ে দিয়ে সোজা চলে যাই এক বৈমানিক শিক্ষাকেন্দ্রে ... এইভাবে শিখি বিমান চালাতে। এর মধ্যে আশ্চর্য কিছু নেই। অতি সাধারণ একটা কাহিনী ... তারপর যুদ্ধ বাধে—জীবনে সবচেয়ে বড় ব্যাপার ... যে রেজিমেন্টের ভার আমার ওপর ছিল সেখানে একবার যা ঘটে সেটা শুনতে হয়তো আপনি কৌতূহলী হতে পারেন। আমাদের এক অফিসার আক্রমণকারী ফরমেশানের পেছন পেছন আসছিল। সাথীদের ছেড়ে কাপুরুষের মতো সে পালায়। তার সামরিক বিচার হবার কথা ছিল। আমি তাকে ডেকে পাঠাই। যে অফিসারের রেকর্ডটা ভালো এরকম কাজ কী করে সে করতে পারে কিছুতেই বুদ্ধিতে পারি না ... যতবার তার কাছ থেকে একটা জবাবদিহি জোর করে আদায় করতে চাই ক্রমাগত সে বলে চলে সে দুঃখিত। তারপর কিছুক্ষণ থেমে সে বলে, “খুব সম্ভব সৎ শিক্ষার অভাব—আমি অনাথ।” স্পিরিটনভকায় চোরের ঘটনাটা আমার মনে পড়ে যায়। চিৎকার করে তাকে আমি বলি, “আপনার মাতৃভূমি, কমন্সমন্স, পার্টির ঘাড়ে দোষটা চাপাতে সাহস করবেন না!” আমার দিকে সে তাকায় হতভম্ব

দৃষ্টিতে, যেন কথাটার যোগাযোগ বন্ধুতে পারছে না... এতো চটে উঠেছিলাম যে তাকে চলে যেতে বলি...

‘...এই গেল অতীতের কথা। বর্তমানে চলেছে যথারীতি সামরিক দৈনন্দিন কাজ। উড়ে বেড়ানো, লেখাপড়া করা আর অন্যদের শেখানো। এইভাবেই চলেছে দিনের পর দিন। এক কথায় মোটামুটি বর্তমান সম্বন্ধে এটাই বলা চলে...

‘...দয়া করে তানিয়া আর ভালেন্তিনের ঠিকানা আমায় পাঠাবেন। তাদের চিঠি দিতে চাই... ভালেন্তিনকে একটা টেলিভিশন সেট কিনে দিলে খুব ভালো হয়। সে কথা ইভান আলেক্সেয়ভিচকে লিখিছ...

‘...আর একটা কথা... দয়া করে খোঁজ নেবেন শেচবার্কেভের কেউ আছে কি না, স্ত্রী কিম্বা ছেলেমেয়ে। দয়া করে কথাটা মনে রাখবেন আর আমাকে জানাবেন... এখনো যথেষ্ট বন্ধুরোহ্রাট আছে। তাই এই সব করুণ ব্যাপারগুলোকে উপেক্ষা করা যায় না।

‘...আর শেষ কথা, আপনি যদি আমার বিষয় লেখেন (সেটা প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয় না) তাহলে আমাকে আমাদের সময়কার বীর হিসেবে খাড়া করবেন না। সেরকম কোনো গুণ আমার নেই। আমি সোভিয়েত দেশের এক অতি সাধারণ অনাথ...’

স্বার্থপর

আমাদের ফ্ল্যাট-বাড়িতে মিশা রমেইকো নামে একটি ছেলে থাকত। আমাদের উঠনের ছেলেরা কেউ তাকে দৃঢ়ক্ষে দেখতে পারত না। সত্যিই তাকে দেখলে ঘেন্না হত। কেন সেটা বলার চেষ্টা করব ...

মুখ-হাত ধুয়ে, পরিষ্কার ইস্ত্রি-করা হাফ প্যান্ট, ভালো করে পালিশ করা জুতো আর গলার কাছে দুটো মখমলের ঝড়ি দিয়ে আঁটা শাদা একটা সার্ট পরে বই হাতে সে বেরিয়ে আসত। বড়িদের মধ্যে বেগিতে বসে পোয়াত বিকেলবেলার রোদ। আমরা যখন হৈ-চৈ করে খেলতাম সে তখন পড়ত। মাঝে মাঝে মিশা মুখ তুলে আমাদের দিকে তাকাত, তার মোটা ঠোঁটে বিদ্রূপভরা হাসি ফুটে উঠত। তাতে আমাদের মনে হত বাস্তবিকই যেন আমরা দোষণীয় বা হাস্যকর কিছু করছি।

এই মিশা রমেইকোর চেহারাটা ছিল সুন্দর। সাদাভায়া স্ট্রীটের এক ফটোর দোকানের জানলায় তার বড়-করা ফটোটা টাঙানো ছিল। বহু বার আমরা লক্ষ্য করেছি লোকেদের সেই জানলার

সামনে দাঁড়িয়ে বলতে, “কী সুন্দর ছেলে!” তার উত্তর আমরা আপত্তি জানিয়ে দিতাম জোরে শিস দিয়ে। তাতে অবশ্য মন্তব্যটা বাতিল হয়ে যেত না।

কিন্তু সত্যিই আমরা চটতাম, কারণ আমাদের বাবা-মাও আমাদের কাছে তাকে তুলে ধরতেন আদর্শ হিসেবে... সবসময়ই তাঁরা বলতেন, “মিশার কাছ থেকে শেখ! দ্যাখ্ সে কী রকম পরিশ্রমী! সমস্ত ইন্সকুলের মধ্যে সে প্রথম!” “মিশা হলে একাজ কখনো করত না,” “তোর নোংরা হাতের জন্য লজ্জা করছে না? মিশার দিকে তাকা দেখি। তার সঙ্গে কি তোর কোনোরকম মিল থাকতে নেই!” এই ধরনের নানা সব কথা। সত্যি বলতে কি এ ধরনের কথা মা আমায় কখনো বলেননি। কিন্তু প্রায়ই তাঁকে দেখতাম সেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, শান্ত-শিষ্ট সর্বজন প্রিয় ছেলোটিকে দেখলে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে। জানতে আমার বাকি ছিল না ঐ দীর্ঘশ্বাসের মানেরটা কী...

হ্যাঁ, আমরা তাকে ঘৃণা করতাম। সামান্য ছুতো পেলেই হয়ত তাকে সানন্দে আচ্ছা করে পেটাতেও পারতাম। কিন্তু সেরকম কোনো ছুতো ছিল না। মিশা রমেইকো খুব চালাক ছিল। সেরকম ছুতো সে আমাদের দিত না। সে ভালো করে জানত তাকে আমরা দেখতে পারি না। তাই সে থাকত সাবধানে। একবার আমরা স্থির করি একটা ছুতো বার করতে। কলিয়া লাস্কি লোকের পিছনে লাগতে ওস্তাদ। এই কাজের ভারটা দেওয়া হয় তাকে। অদ্ভুত প্রকৃতির আর আন্তরিক বন্ধু

হিসেবে তার খ্যাতি ছিল। তার মাথায় মনে হত ছিট আছে। অনায়াসে সে অতি খাপছাড়া ধরনের কাজ লোককে দিয়ে করাতে পারত। এখনো আমি বৃদ্ধিতে পারি না ইঁস্কুলে পড়ার সময় আমাকে দিয়ে সে ওরকম একটা পাগলামি কাণ্ড কী করে করিয়েছিল। ইঁস্কুলের সবচেয়ে কড়া শিক্ষক তখন ক্লাশ নিচ্ছিলেন। আমি তখন চড়া গলায় একটা গানের প্রথম কয়েক লাইনের সদুর ভাঁজি প্রমাণ করতে যে শিক্ষকদের ভয় করি না। ফলে এক সপ্তাহ আমার ইঁস্কুল যাওয়া বন্ধ হয়। কিন্তু যখন এর জন্য তাকে মারতে যাই এই কথাটা বলে আমার মদুখ একেবারে সে বন্ধ করে দেয়, “পরের বার নিজের ঘিলুটা ব্যবহার করিস।” কথাটা সে ঠিকই বলেছিল।

যাই হোক, কলিয়া লাস্কির উপর ভার দেওয়া হল মিশাকে রাগানোর। আমরা জানতাম তারপর কী করতে হবে... বেগিতে কলিয়া তার পাশে গিয়ে বসল। আমরা কাছাকাছি ঘুর ঘুর করতে লাগলাম। ঘণ্টাখানেক প্রায় কেটে গেল। কলিয়া আর মিশা গল্প করতে লাগল হাসিখুঁসিভাবে... কিছুই ঘটল না কিন্তু। কলিয়াকে অস্থির হয়ে উঠতে দেখে আমরা কাছে গিয়ে শুনলাম রমেইকো তাকে প্রশ্ন করছে:

‘সবসময়ই তুমি সত্যি কথা বলো, তাই না?’

‘নিশ্চয়ই,’ দৃঢ় স্বরে বলল কলিয়া। বাস্তবিকই মিথ্যে কথা বলা ছাড়া যেকোনো কাজ সে করতে পারত।

‘তাহলে একটা কথার জবাব দাও... সবাইকার সামনে।

তুমি একটা মারামারি বাধাবার চেষ্টা করতে এখানে এসেছো, তাই না?’

কলিয়ার মুখটা টকটকে হয়ে উঠল। আমাদের কয়েকজনের মুখও হয়ে উঠল লাল। দু’এক মিনিট সে চুপ করে থেকে দাঁড়িয়ে উঠল, তারপর কোনো কথা না বলেই ছুটে বেরিয়ে গেল উঠন থেকে। না, মিশা রমেইকোর চোখে ধুলো দেওয়া যায় না!

একবার ইস্কুলে আমাদের পাইয়োনিয়ার নেতা রমেইকোকে প্রশ্ন করেন কেন সে ইয়াং পাইয়োনিয়ার দলে যোগ দেয়নি। দম বন্ধ করে আমরা অপেক্ষা করে থাকি। আমাদের পাইয়োনিয়ার দলে সে যে যোগ দেবে এটা আমাদের বরদাস্ত হয় না! কারণ আমাদের কাছে তাকে নিশ্চয়ই তুলে ধরা হবে আদর্শ পাইয়োনিয়ার হিসেবেও। কিন্তু ইয়াং পাইয়োনিয়ার হবার মিশা রমেইকোর একেবারেই কোনো ইচ্ছে ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে সে উত্তর দিল। সেটাকে শোনাল যেন মুখস্থ করা একটা ফরমুলা:

‘ইয়াং পাইয়োনিয়ারের চেষ্টা থাকা উচিত লেখাপড়া আর স্বভাবের দিক দিয়ে সে যেন আদর্শ হয়ে ওঠে। তাই না? আমায় বলুন, কোনো দিক দিয়ে আমি কি পেছিয়ে আছি?’

এই বলে সে অমায়িকভাবে তার সরল নীল চোখদুটো তুলে তাকাল পাইয়োনিয়ার নেতার দিকে। নেতা যে কী বলবেন বুঝতে পারলেন না।

‘তুমি কিন্তু খুব কাজের নও,’ বিড়বিড় করে তিনি বললেন।

‘সত্যি?’ রমেইকো ভুরু কুঁচকে দারুণ একটা অবাক ভাব দেখাল। ‘কিন্তু আমি ভাবতাম নানা ধরনের সভায় সময় নষ্ট করি না বলেই ভালো করে লেখাপড়া করতে পারি, শেচবাকভ আর লাস্কি’ যে রকম সময় নষ্ট করে থাকে...’ এটা একটা চতুর চাল: তলিয়া শেচবাকভ আর কলিয়া লাস্কি’ পাইয়োনায়ার হিসেবে খুব উৎসাহী কিন্তু লেখাপড়ায় সাধারণ। এ কথার উত্তর কী দেবেন নেতা ভেবে পেলেন না। সামান্য হাত নাড়িয়ে তিনি চলে গেলেন।

আরেকটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে... আমাদের ইস্কুলের সব ছাত্ররা গেছে গাছ পড়তে। সেটা আনন্দের আর মজার কাজ। এখনো আমার মনে আছে সেই রৌদ্রোজ্জ্বল দিন আর সেই বিশেষ আনন্দের অনুভূতিটা যার দরুণ আমাদের গৌরবের বস্তু হয়ে উঠেছিল সেই হৈ-চৈ ভরা আর এলোমেলো কাজের প্রতিটি মুহূর্ত... প্রত্যেকের জন্য অবশ্য কোদাল ছিল না (ভালিয়া আর্থ’পভ আর আমি কাছের এক স্কী করার স্টেশান থেকে আমাদের জন্য জোগাড় করেছিলাম কোদাল), গাছের চারা অল্পক্ষণের মধ্যেই শেষ হয়ে যায় (নতুন চারা পেঁছয় সন্দের দিকে) আর প্রতিশ্রুত খাবারগুলো একেবারেই পেঁছয়নি। কিন্তু এই অসুবিধে কি আর আমাদের উৎসবের মনোভাবকে দাবিয়ে রাখতে পারে? কখনো না! মহা ফুর্তিতে আমরা কোদাল খুঁজে বার করি, মহা ফুর্তিতে আমরা যে চারাগুলো দেরি করে পেঁছেছিল সেগুলো পুঁতি আর পরম

আনন্দে পরস্পরের পেটের খিদের গুড়গুড় শব্দটা নিয়ে আলোচনা করি!..

একসপ্তাহ পরে এক কেন্দ্রীয় খবরের কাগজের প্রতিনিধি আসেন আমাদের ইন্সকুলে। দু'জন তিনজন করে আমাদের ডাক পড়ে শিক্ষকদের ঘরে। সেই ঘরে ছিলেন চারজন লোক: হেডমাষ্টার, জীববিদ্যা মাষ্টার, জেলা কম্‌সমল কমিটির সেক্রেটারি আর সেই সাংবাদিক।

‘তুমি গাছ পোঁতায় যোগ দিয়েছিলে?’

‘হ্যাঁ, দিয়েছিলাম।’

‘কটা গাছ পুঁতেছিলে?’

‘প্রায় দশটা।’

‘তোমার শীত করেছিল?’

‘কী বললেন?’

‘কীরকম ঠান্ডা ছিল?’

‘আমার তো সেরকম মনে পড়ছে না। আমার বেশ যেন গরমই মনে হয়েছিল।’

‘কোদাল ছিল কি?’

‘হ্যাঁ।’

‘গাছের চারা ছিল?’

‘হ্যাঁ।’

‘কেউ কেউ বলছে যে কোদাল কিম্বা গাছের চারা কিছুই ছিল না। ছিল শূন্য খিদে, ঠান্ডা ইত্যাদি। এ কথা কী সত্যি?’

‘না, এটা মিথ্যে কথা। সবকিছুই ছিল চমৎকার। আমাদের সবাইকার ভালো লেগেছিল।’

‘আর কোনো প্রশ্ন নেই। তুমি যেতে পারো।’

আমাদের প্রশ্ন করার পর করিডরে জড়ো হয়ে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করতে লাগলাম। কিন্তু মাথা-মুণ্ডু কিছুই বদ্বতে পারলাম না। তাই অল্পক্ষণের মধ্যেই করতে লাগলাম নানা আজগুবি অনুমান। তলিয়া শেচবাকভ এমন কি ইঙ্গিত করে বসল যে এই সাংবাদিক আসলে এক ছদ্মবেশধারী ডিটেকটিভ, এসেছেন যেদিন গাছ পোঁতা হয় সেদিনকার এক খুন বা ডাকাতির রহস্যের সমাধান করতে।

ইস্কুল শেষ হবার পর আমরা জড়ো হলাম হল-ঘরে। আবহাওয়াটা উত্তেজনায় টানটান: সবাই অপেক্ষা করে রয়েছে ব্যাপারটা জানার জন্য।

সাংবাদিক বক্তৃতা দিতে উঠলেন। অনেকক্ষণ ধরে তিনি বক্তৃতা দিলেন। কিন্তু তাতে কেউ বিরক্ত হ'ল না, এমন ইন্টারেস্টিং ছিল তাঁর বক্তৃতাটা। আমাদের সবচেয়ে আজগুবি অনুমানের চেয়েও বেশি আজগুবি শোনাল সেটা। জানা গেল মিশা রমেইকো সেই খবরের কাগজের সম্পাদককে এক চিঠি লিখেছিল! তাইতেই এই হৈ-চৈ! সে বর্ণনা দিয়েছিল গাছ পোঁতার ব্যাপারটা কী রকম আনাড়ির মতো করা হয়। ‘কোদাল বাদ দিয়ে সংগঠকরা গাছ পোঁতার এক মৌলিক পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। এমন কি গাছ বাদ দিয়েও ... খিদেয় কাতর

ছেলেমেয়েরা চারদিকে টলে টলে বেড়াচ্ছে ... চারদিক থেকে শোনা যাচ্ছে কণ্ঠকর কাশির শব্দ ...' এ ধরনের আরো নানা কথা। চিঠিটা যখন পড়া হল তখন শ্রোতার কী হাসিটাই না হেসেছিল! হাসতে হাসতে তলিয়া শেচবাকভের চোখে জল এসে গেল ...

সাংবাদিক তখন বললেন যে সংগঠন কাজের সত্যি কিছু দোষ ঘুটি ছিল। কিন্তু তাঁর মনে হয় ছাত্র রমেইকোর চিঠিটা লেখা হয়েছে একটা ভুল মনোভাব নিয়ে। তিনি আরো বললেন যে তরুণ পাইয়োনায়ারের যেভাবে আচরণ করা উচিত তাঁর মতে রমেইকো তা করেনি।

‘ও পাইয়োনায়ার নয়!’ নিজের জায়গা থেকে চেঁচিয়ে উঠল কলিয়া লাম্বির্ক।

‘ওঃ, এবার ব্যাপারটা বদ্বল্যাম!’ সাংবাদিক বললেন। তুমুল হাততালি পড়ল। হেঁচ-চৈ করে সবাই রমেইকোর কাছে চাইল জবাবদিহি। বুদ্ধিমানের মতো রমেইকো সরে পড়েছে দেখার পর হেঁচ-চৈটা থামল। সেই সভার পর থেকে আর কখনো সে আমাদের ইন্সকুলে আসেনি। অল্পদিনের মধ্যে আমরা জানতে পারলাম সে ইন্সকুল বদল করেছে। বাড়িতে আমাদের সঙ্গে সে আরো বেশি করে এড়িয়ে চলতে লাগল।

মিশা রমেইকো সম্বন্ধে একথাগুলোই শুধু আমার মনে আছে। এবার তার মা-বাবা সম্পর্কে দৃঢ়তার কথা বলি। মিশার মাকে আমরা চিনতাম না। কেন জানি না কখনো তাকে আমরা বাইরে আসতে দেখিনি। মিশার বাবা ছিল উকিল, এখন মনে

পড়ছে তখনকার ফ্যাশনাবল্ উকিল। তাদের ছিল প্রচুর টাকা। হয় মোটর গাড়ি করে কিম্বা ফিটনে উকিল ফিরত বাড়িতে। পরত চমৎকার চমৎকার পোষাক। এখনো আমার মনে পড়ে কোঁকড়া ফারের তৈরি তার শীতকালের ক্লোকটা। আমার বাবা একবার বলেছিলেন যে ঐ ফার কোটটার দাম একটা বাড়ির সমান। আর একবার বাবাকে শুনিয়েছিলাম মাকে বলতে, “কী করে পকেটে আস্তুর লাগাতে হয় যদি কেউ জানে তাহলে সে হচ্ছে ঐ রমেইকো।” মাঝখান থেকে আমি প্রশ্ন করে বসি যে পকেটে তার আস্তুর লাগাবার দরকারটা কী, আর জানতে চাই বাবা ঐ লোকটির ফার কোট সম্বন্ধে কথাটা বলছেন কি না। কথাটা শুন্যে বাবা আর মা অনেকক্ষণ ধরে হাসেন...

রমেইকোদের খোঁজ করতে শুরুর করি। কিন্তু তাতে বিশেষ উৎসাহ বোধ করি না। শুরুর সামান্য কোঁতড়ল ছিল মিশার কী হয়েছে জানার জন্য। আগে থেকেই যেন একটা অশুভ কিছুই আঁচ পেয়েছিলাম। প্রথমেই জানতে পারলাম সেই উকিল রমেইকো অনেকদিন আগে মারা গেছে, যুদ্ধের আগেই। কৃষ্ণসাগরের তীরে একজায়গায় সে ছুঁটি কাটাচ্ছিল। সেখানে তার ডোঙাটা ডুবে যায়। ভালেস্তিন আর তানিয়াকে সে কথা বলায় ভালেস্তিন শুরুকনো হেসে মন্তব্য করল:

‘বাজি রেখে বলতে পারি সে সাঁতার জানত না।’

উকিল রমেইকোর মৃত্যুর পর সংসারটা ভেঙে যায়। মিখাইলের মা ককেশাসে চলে যায় বসবাস করতে। সেখানে তার

স্বামীকে কবর দেওয়া হয়। পড়াশুনোর জন্য মিথাইল থেকে যায় মস্কাতে। কিন্তু তারা তাদের ফ্ল্যাটটা বদলেছিল কিম্বা খুব সম্ভব সেটাকে করে দিয়েছিল বিক্রি। মিথাইল আর সেখানে থাকত না। এসব খবর পেলাম রমেইকোদের প্রতিবেশীদের কাছ থেকে।

এর পরে শূদ্ধ বাকি রইল মিথাইলের খবর করা। বাড়ির ম্যানেজারের আপিসে গেলাম। আমার ক্ষীণ আশা প্রথম প্রচেষ্টাতেই তার নতুন বাড়ির ঠিকানাটা পাব।

ডেস্কের পিছনে একটি লোক বসেছিল। তার মুখটা ক্লান্ত ও চোখদুটি নিদ্রালু। গোঁফের দুটো দিক মোম দিয়ে সরু করে পাকানো। দেখলে মনে হয় যেন অপটু হাতে আঠা দিয়ে সেটা এঁটে দেওয়া হয়েছে। তার সামনে ছিল একটা মোটা বহু ব্যবহৃত খাতা। সেখান থেকে চোখ না তুলেই আমার কথাগুলো সে শুনল। মনে হল যেন রোমাঞ্চকর উপন্যাসের মতো খাতাটা তার সমস্ত মনোযোগ আকর্ষণ করে রেখেছে, যদিও সেটা শূদ্ধই বাসিন্দাদের নাম-ধামের রেজিস্টারির তালিকা।

‘বাসিন্দাদের গতিবিধির খবরটা গোপনীয়। সাধারণ লোককে জানানো বারণ...’

“সাধারণ লোকের” সীমারেখা পেরুবার জন্য আমি আমার খবরের কাগজের কার্ডটা বার করে তাকে দিলাম। কার্ডটা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে লোকটি বলল:

‘এটা অবশ্য অন্য কথা। কিন্তু দেখাবার মতো খাতাটা নেই। যেটা আপনার দরকার ১৯৪১-এর অক্টোবরে সেটা পড়ুড়ে গেছে।’

তারপর আমার পরিকল্পনার কথা বলে চেষ্টা করলাম লোকটিকে উৎসাহিত করতে। সর্বিস্তারে তাকে জানালাম কেন আমি মিখাইল রমেইকো আর অন্যান্য ছেলেদের খোঁজ করছি... লোকটির নিরুৎসাহ ভাবটা কেটে গেল। আমার দিকে চোখ না গোঁফ কি একটা মটকে ডেস্কের পিছন থেকে উঠে সে খুলল একটা কাগজ বোঝাই আলমারি... আমার ছেলেবেলার বন্ধুদের খুঁজে বার করতে সাহায্য করেছে বলে এই সুযোগে লোকটিকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তার একধেয়ে কর্তব্যকাজের চেয়ে অনেকবেশি সে উৎসাহ দেখাল আমার সমস্যাটার উপর। সে এমন কি সহরের নানা জায়গায় গেল। আর আমার জন্য লিখে দিল নানা চিঠি, টেলিফোনও করল। ইভান তেরেন্‌তিয়েভিচ, আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করো!..

অবশেষে জানতে পারি যে মিখাইল ইগরেভিচ রমেইকো থাকে দ্বিতীয় ঙ্ভেস্ক'য়া-য়াম্‌স্কায়া স্ট্রীটে। সেখানে গেলাম। পুরোনো বাড়ির দোতলায় উঠে একটা দরজার সামনে পৌঁছলাম। সেটার উপর বহু টিনের চিঠির বাস্তু পেরেক দিয়ে আঁটা। দেখাচ্ছে যেন একটা স্ট্রিং-রুম প্রবেশপথ। টোকা শব্দে একটি স্ট্রীলোক দরজাটা খুলে দিল। তার হাতে একটা হাতা। সে জানাল রমেইকো রাত করে বাড়ি ফেরে। তার সঙ্গে

দেখা করার সবচেয়ে ভালো সময় রবিবার। ভাবলাম, অনায়াসে পরের রবিবার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারি...

রৌদ্রোজ্জ্বল রবিবারের এক সকালে চলছি রমেইকোর সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু যার সঙ্গে দেখা করতে চলছি আমার ভাবনাগুলো তাকে ছেড়ে অনেক দূরে চলে গেছে। আগের দিন তানিয়া আমাকে বলেছিল একদল কলেজের ছাত্রের কথা। তারা এসেছিল ভালেস্তিনের সঙ্গে দেখা করতে। তার জন্য এনেছিল ফুল আর নানা উপহার। জানতে চেয়েছিল তার কোনো জিনিসের দরকার আছে কি না। উত্তরে ভালেস্তিন প্রশ্ন করে আর কোনো শিক্ষকের সঙ্গে তারা দেখা করতে যাচ্ছে কি না। তাদের এই দেখা করতে আসাটা অসাধারণ, আসলে এসেছিল তার অসুখের জন্য, কথাটা বদ্বাতে পেরে ভালেস্তিনের মুখটা কালো হয়ে যায়।

সে বলে, 'শোনো তাহলে, আমার এই জিনিসটার দরকার — তোমাদের সব উপহার আর ফুল নিয়ে প্রফেসর গল্দুবেভের সঙ্গে দেখা করতে যাও। তাঁর স্ত্রী একমাস আগে মারা গেছেন...'

ছাত্ররা বিড়বিড় করে তাকে বলে পার্টি সেক্রেটারির নির্দেশের কথাটা। ততক্ষণে দারুণ চটে উঠেছে ভালেস্তিন। তাদের সে চোঁচয়ে ধমকায়। উপহারগুলো নিয়ে স্ফুটস্ফুট করে তারা বেরিয়ে যায় অধ্যাপক গল্দুবেভের সঙ্গে দেখা করতে। সেই সন্ধেতেই কলেজের পার্টি সেক্রেটারি ভালেস্তিনকে ধন্যবাদ দিতে আসে তার উপদেশের জন্য...

ভাবলাম ভালেস্তিনের হৃদয়টা ভারি উদার!..

চিঠির বাক্সগুলো দিয়ে আবৃত দরজায় টোকা দিলাম। ভিতর থেকে শব্দনতে পেলাম একটা হাত ছিটকিনিটা খোঁজার চেষ্টা করছে। দরজা খুলে গেল। দেখলাম লম্বা একটি লোক। তার মুখে তিনদিনের দাড়ি। গেঞ্জিটা ময়লা-ময়লা। তার উপর কোনোরকমে কোর্টটা জড়ানো।

‘কার সঙ্গে দেখা করতে চান?’

‘মিখাইল ইগরেভিচ রমেইকো।’

‘সত্যি!’ তার ফোলা ফোলা চোখের পাতাগুলো কেঁপে উঠল। একজোড়া টকটকে লাল চোখ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। ‘আমিই। ভেতরে আসুন...’

যে বড় ঘরটায় ঢুকলাম সেটার চেহারা অদ্ভুত। যুদ্ধের সময় বোমা বিধ্বস্ত নিষ্প্রাণ ঘরগুলোর মতোই সেটাকে আমার মনে হল। সেরকম ঘরের মধ্যে তাকালে দেখা যায় আসবাবপত্র, দেয়ালে ছবি, খাবারের আলমারিতে নানা ডিশ, সাধারণ সব সাংসারিক জিনিসপত্র। কিন্তু ঘরটায় যেন প্রাণের আভাস নেই। তাইতে এই সব পরিচিত জিনিসগুলো অদ্ভুত অন্যরকম দেখায়।

রমেইকোর ঘরের জিনিসপত্রের মধ্যে আছে সুদৃষ্টির পরিচয়। দেয়ালে ঝুলছে কয়েকটা দামী দামী ছবি। দেয়ালের পাশে সারি সারি বই ভর্তি আলমারি। মোটা কাপড়ের পর্দার পিছনে ঢাকা রয়েছে দুটো বড় জানালা। পর্দাগুলো এখনো টানা। তাদের ভিতর দিয়ে শুধু এসেছে সরু দুফালি রোদ। শুধু

এই আলোর জন্যই ঘরটাকে মনে হতে পারত কেউ সেখানে থাকে না। সর্বত্রই ঘন ধূলো। ঘরের অন্য প্রান্তের কোণের ঘন অন্ধকার একটা সেটিং-কে ঢেকে রেখেছে। তার উপর ডাঁই করা কোঁচকানো বিছানার চাদর। টেবিলের উপর দোমড়ানো খবরের কাগজগদুলোর মধ্যে পড়ে রয়েছে একটা বাসি রুটি, সসেজের প্রচুর ছাল আর কয়েকটা বই। একটা বই-এর মলাটের অক্ষরগুলো আমার চোখে পড়ল কেন জানি না। বইটার নাম Notre Dame de Paris।

‘বলুন, কী দরকার?’ খিটখিটে সুরে বলল রমাইকো।

আমার নাম জানিয়ে তাকে প্রশ্ন করলাম স্পিরিডনভকা সময়কার আমাকে তার মনে আছে কি না। কপাল কুঁচকে সে শূন্য করল আঙুল দিয়ে তার খোঁচা খোঁচা দাড়িওলা চিবুকটা ঘষতে। লক্ষ্য করলাম এখনো তার চেহারাটা সুন্দর — কপালটা প্রশস্ত, চোখদুটো সুস্পষ্ট নীল আর ঠোঁট ও চিবুকটা মেয়েলী ধরনের। দাড়ি না কামানো সত্ত্বেও তাকে সুন্দর দেখাচ্ছে।

‘দুঃখিত। আপনার কথা মনে পড়ছে না,’ নীচু গলায় সে বলল। তারপর তাড়াতাড়ি আতঙ্কিত সুরে প্রশ্ন করল, ‘কিন্তু কী হয়েছে?’

বিশেষ ইচ্ছে করল না তাকে আমার পরিকল্পনার কথাটা জানাই। কিন্তু এখন আর পিঁছিয়ে যাওয়া যায় না। তাই সংক্ষেপে নিরুৎসাহভাবে তাকে কথাটা জানালাম। প্রশ্নটা যখন সে করেছিল তখন তার মুখটা উত্তেজনায় টানটান আর

আতঙ্কিত ছিল। এখন সেখানে ফুটে উঠেছে সম্পূর্ণ একটা বিহ্বল ভাব।

‘এ কারণে আমি চাই আপনি আপনার জীবনের কথা আমায় বলেন,’ এই বলে আমি শেষ করলাম।

রমেইকো একটিও কথা বলল না। এখন যে-মুখটা আমার দিকে তাকিয়ে সেটা আর সুন্দর নয়, তার ফিকে চোখে ইম্পাতের ঝিলিক দেখা দিল।

অবশেষে খুব স্পষ্ট করে সে বলতে লাগল, ‘আমার যা ঘটেছে তার সঙ্গে কারুর সম্বন্ধ নেই... তাতে কারুরই কোনো কৌতূহল থাকার কথা নয়... আপনাকে আমি কোনো কথা বলব না।’

সে দাঁড়িয়ে উঠে এমন একটা ভঙ্গি করল যাতে বুঝলাম আলোচনাটা শেষ হয়েছে। নীরস স্বরে পরস্পরকে বিদায় জানিয়ে চলে এলাম।

পরের রবিবার রমেইকো আমাকে টেলিফোন করল। আমার সঙ্গে সে দেখা করতে চায় আর দেখা করতে চায় এক্ষুনি। তার কথাগুলো অস্পষ্ট আর বাধো বাধো। মনে হল সে মদ খেয়েছে। পরে জেনেছিলাম ভুল ভাবিনি।

আমরা স্থির করলাম মায়াকভস্কি স্কয়ারের মেট্রো স্টেশানের প্রবেশপথে দেখা করব...

দেয়ালে ঠেস দিয়ে সে দাঁড়িয়েছিল। তার কোঁচকান স্যুটের নানা জায়গায় কাদা লাগা। আমাকে দেখতে পেয়ে দেয়ালটা

ঠেলে এগিয়ে এসে আমার দিকে সে একটা হাত বাড়াল। তারপর টলতে টলতে খুব কাছে এসে চেঁচিয়ে বলল:

‘হ্যালো। একটা স্বীকারোক্তি করতে চাই... তোমাকে বলব আমার অভিশপ্ত জীবনটার সব কথা...’ তার চোখে মাতালের কান্না।

‘তোমার বাড়ি যাওয়া উচিত,’ তীক্ষ্ণ গলায় বলে তার হাতটা আমি সরিয়ে দিলাম।

‘আমার কোনো বাড়ি নেই... আমার নেই...’ মাতালের গলায় বারবার বলতে লাগল সে। পথের লোকদের উপর সে টলে টলে পড়তে লাগল।

‘চলো, তোমায় বাড়ি নিয়ে যাই!’ তাকে বলতে বাধ্য হলাম। তাকে প্রায় টেনে নিয়ে চললাম। আমার হাতে সে শরীরের ভর ছেড়ে দিয়ে চলল। অস্পষ্ট স্বরে বিড়বিড় করে বকতে বকতে হাঁটতে লাগল বাধ্য লোকের মতো।

দরজার কাছে পেঁাছে অনেকক্ষণ ধরে সে পকেট হাতড়াল চাবিটার জন্য। চাবিটা খুঁজে না পেয়ে দরজায় মারতে শুরু করল ঘৃষি। কেউ উত্তর দিল না।

‘হতভাগা ইন্দুর কোথাকার, গতে ঢুকে আছিস, না?’ চেঁচিয়ে উঠল সে।

ছোট্ট একটি মেয়ে দরজা খুলে দিল। রমেইকোকে দেখে সে সিঁটিয়ে পিছিয়ে গেল...

নিজের ঘরে এসে একটা আরাম কৈদারায় গা এলিয়ে দিয়ে
সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ গলায় সে বলল:

‘এর কোনো মানে হয় না...’ মনে হল আমাদের দেখা
হওয়ায় সে খুঁসি হয়নি।

তাকে জোর করে কথা বলাবার ইচ্ছে ছিল না। তাই সোজা
চললাম দরজার দিকে।

‘দাঁড়াও,’ চেঁচিয়ে উঠল সে। ‘স্বীকারোক্তিটা তুমি শুনতে
পাবে! চুলোয় যাক সবকিছু... আমি... আমাদের এই হতচ্ছাড়া
জীবন...’

সে বলতে শুরু করল:

‘বহুকাল আগেই আমার মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু এখনো টিকে
আছি... এমন কেউ নেই যাকে আমার কথা বলি। তদন্তকারীর
কাছে আমায় নিয়ে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করে ছিলাম। কিন্তু ওরা
আমায় নিয়ে গেল না। ওরাও নিশ্চয়ই ভাবছে আমি মরে গেছি।
ঠিকই ভেবেছে! দয়া করে কাঁধ ঝাঁকিয়ে না!.. তদন্তকারীর জন্য
যেটা ঠিক করে রেখেছিলাম তার সব কথাই তোমায় বলব —
পুরো ঘটনা কাহিনীটা। আমাকে যেমন দেখছো সেরকম
দেখবে বলে তুমি আশা করোনি, তাই না? বলো, তাই কি না?
আর জানো এর জন্য সব দোষ কার? প্রত্যেকটা জিনিসের জন্য!
আমার পুজনীয় বাবা, ইগর পাভলভিচ রমেইকো... জানো কী
করে তাঁর জীবন শেষ হয়? ঠিক, তিনি ডুবে গিয়েছিলেন। তাঁর
ডোঙাটা উল্টে যায়, সোজা তিনি তলিয়ে যান। একেবারে

সোজা। কিন্তু এখনো, আজকের দিনেও আমাকে তিনি ডোবাচ্ছেন। কী? এভাবে নিজের বাবার কথা বলা খুব খারাপ? হা-হা! কিন্তু আমার মৃত্যুর জন্য কে দায়ী? নিশ্চয়ই কেউ দায়ী?! দায়ী তিনি! তিনি! আমি যখন ছোট্ট ছেলে তখন থেকেই আমাকে তিনি ডোবাতে শুরু করেন। “আমাদের মিশা অসাধারণ প্রতিভাবান ছেলে!..” “আমাদের মিশার ভবিষ্যৎ ভারি উজ্জ্বল!” এসব কথা ক্রমাগত তিনি বলতেন। তাঁর প্রিয় বুলিটা ছিল “উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ”... ইগর পাভলভিচ রমেইকো, আপনার কথাটাকে আমি মিথ্যে বলে প্রমাণ করছি! আপনার প্রতিভাবান ছেলের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎটা ছারখার হয়ে গেছে... সাবানের বুদ্ধদের মতো গেছে চুরমার হয়ে...

‘তুমি অতো অবাক হচ্ছে কেন?.. তুমি জানো না আমার কী ভাবে তিনি মানুষ করেছিলেন... সেই জঘন্য উজ্জ্বল ভবিষ্যৎটা কী করে নিশ্চিতভাবে পাওয়া যায় তার দিকে আমার সমস্ত মন দিতে বাধ্য করেছিলেন! সবচেয়ে বড় কথা আমাকে নিজের প্রতি যত্ন নিতে হত। কাজে লাগাতে হত প্রত্যেকটি ঘণ্টা, প্রত্যেকটি মিনিট! সব দিকে লক্ষ্য ছিল আমার পূজনীয় বাবার। সেই গাছ পোঁতার কেছার কথাটা তোমার মনে আছে তো? তিনিই সম্পাদকের কাছে সেই চিঠিটা মৃখে মৃখে বলেন! নিজে হাতে দিয়ে আসেন সেটা। কেন তা করেছিলেন? কারণ তাঁর প্রতিভাবান ছেলে ভিজে পায়ে বাড়ি ফিরেছিল। কার সাহস আছে ও ধরনের জঘন্য অপরাধ করতে পারার? তাঁর

আদুরে ছেলের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎটাকে কে বিপদগ্রস্ত করতে পারে? ..

‘ঝামেলা এড়াবার জন্য ইস্কুল বদলাবার পর তিনি আমায় বলেন, “তোমার একটি মাত্র জীবন। সে জীবনটাকে যদি বাজে কাজে খরচ করো তাহলে আর একটা জীবন কেউ তোমাকে দেবে না।” কথাটা শুনলে আমি ভীষণ অবাক হয়ে যাই। কথাগুলো আমার বন্ধুর রক্তকে হিম করে দেয়। তখন থেকেই আমি বিখ্যাত হবার, মোটরগাড়িতে ঘুরে বেড়াবার, বহু শ্রোতার সামনে বক্তৃতা দেবার আকাশকুসুম রচনা করতে শুরুর করি ... পাইখানায় বসে কত বক্তৃতাই না দিয়েছি!.. হেসো না! তুমি বুঝতে পারছো না আমাদের সংসারে বাবার আসন কোথায় ছিল। তিনি ছিলেন পবিত্র বিগ্রহ! সবচেয়ে বড় বিচারক আর ভবিষ্যদ্বক্তা! মা তাঁকে পাগলের মতো ভালোবাসতেন, ভয় করতেন তার চেয়েও বেশি। আপ্রাণ তিনি আমার মধ্যে এই বিশ্বাসটা জন্মাতে চেয়েছিলেন যে আমার বাবা এক অতিমানব।

‘ছেলেবেলায় আমার মনে খুব সহজেই ছাপ পড়ত। আমি খুব পড়তাম। প্রত্যেক বই পড়ার পর প্রথম মনে জাগত ভয়: আমার জীবনটাও যদি ওরকম হয়ে দাঁড়ায়! বই-এর ভালোর চেয়ে খারাপ দিকটা আমি অনেক বেশি করে দেখতাম। আর সবসময় মনে থাকত জীবন সম্বন্ধে বাবার কথাগুলো। জীবন একটি!.. মাত্র একটি!.. আমার দামী জীবন থেকে একটি ঘণ্টাও যাতে বাজে খরচ না হয় সে রকম সব কাজই আমি

যেতাম এড়িয়ে। কম্‌সমল আমার জন্য নয়। সমাজের অন্য কোনো কাজও নয় আমার জন্য। একমাত্র দামী শূদ্ধ আমি, আমি ছাড়া আর কেউ নয়...

‘বাবাই আমার হয়ে বেছে দেন বাড়ি তৈরি করতে শেখার ইনস্টিটিউট। তিনি বলেন যে যুদ্ধের সময় ইঞ্জিনিয়ারদের গুলির সামনে যেতে হয় না। এ বিষয়ে তিনি একটা গানও জানতেন—এক মিনিট সবুজ করো, গানটা যেন কী? হ্যাঁ, মনে পড়েছে:

সার বেঁধে মার্চ করে চলেছে মৃত্যু পথে
পদাতিক দল, তাদের পিছন পিছন অশ্বারোহী বাহিনী,
তারপর দেখা দিল গোলন্দাজ বাহিনী,
সবার শেষে ইঞ্জিনিয়ার দল...

‘আবার ভাবলাম বাবার কথাই ঠিক। সবকিছু আগে থেকে তিনি বুঝতে পারেন!..

‘অনার্স’ নিয়ে ইনস্টিটিউট পড়া আমি শেষ করলাম। থার্ড ইয়ারে পড়তে পড়তেই আমার একটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ছাপা হয়। তখন ফেরো-কংক্রিটের ওপর আমার খুব ঝোঁক। ফেরো-কংক্রিটের ওপর পৃথিবীর বিখ্যাত বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ভরবিওভ আমায় বলতেন তাঁর সবচেয়ে বড় আশা। তিনি আমাকে বলেন “আকাদেমি অফ মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ার্স”এ যোগ দিতে। তখন

সবাইকার মন্থেই যুদ্ধের কথা। তাই যুদ্ধের সময় নিরাপদ জায়গা হিসেবে আকাদেমিতে আমি যোগ দিই...

‘১৯৩৯-এ আমি বিয়ে করি—ওই যে ওখানে সে... (কাঁধের ওপর মাথা ঝুঁকিয়ে একটি সুন্দরী মহিলার বড় ফটোর দিকে সে ইঙ্গিত করল।) তাকে আমি পাগলের মতো ভালোবাসতাম। সত্যি বলছি এমন কি তার জিনিসগুলোর ওপরেও আমার হিংসে হত! তাকে আমি ইনস্টিটিউট থেকে ছাড়িয়ে নিই। যতটা সময় না থাকলেই নয় তার এক মন্থহৃত বেশি আমিও ইনস্টিটিউটে থাকতে পারতাম না। এই ঘরটা ছিল আমার স্বর্গ... আমার সব আনন্দ... আমার মনে পড়ে কী করে কিনেছিলাম ওই আরাম-কেদারা, এই শেল্ফ, প্রত্যেকটি জিনিস... ওই ছিল আমার জীবন। আমার প্রতিটি উদ্যম তার ওপর নিয়োগ করেছিলাম। ভালো কথা, কেউ জানে না ফেরো-কংক্রিট ব্লক হিসাব করার আমার সেই প্রবন্ধটা, যেটা অমন উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল, নির্ধারিত সময়ের একবছর আগেই দিয়ে দিয়েছিলাম— কারণ আমার তখন খুব দরকার সেই কুড়ি হাজার রুবলের। পুরো গ্রীষ্মকালের জন্য ককেশাসের কৃষ্ণসাগরের তীরে গাগরায় যাব বলে আমরা ঠিক করেছিলাম। এক কথায়, ফেরো-কংক্রিট ছিল আমার গবেষণার বিষয়, পেশা, সাফল্য, আর যশ... কিন্তু জীবনটা কাটিয়েছিলাম এখানে এই ঘরে। এক আমেরিকান পত্রিকায় একবার পড়ি জীবনের মানে সম্বন্ধে এক প্রবাদবচন। সেটাকে আমার মনে হয় চরম জ্ঞানের

কথা। তাতে লেখা ছিল জীবনের মানে হচ্ছে মেয়ে এবং লোকে সেই মেয়ের জন্য যে সব কাজ করে সেগুলো। পাইখানায় টয়লেট কাগজের বাস্তের ওপর জার্মানরাও ওধরনের কথা ছাপিয়েছে। কী বললে?... না, ভলগা থেকে এল্‌ব্‌ পর্যন্ত সেই বীরত্বপূর্ণ মার্চ আমি করে যাইনি। কিন্তু আমি ছিলাম জার্মানিতে। আমার পথটা একাধারে ছিল দীর্ঘ আর সংক্ষিপ্ত ... এক কথায়, আমি সেখানে ছিলাম POW হিসেবে। আমি আত্মসমর্পণ করেছিলাম। হ্যাঁ, সোজা আত্মসমর্পণ করেছিলাম। অবশ্য সেটাকে আমি এড়াতেও পারতাম।

যুদ্ধের মাত্র একমাস আগেই প্রথম ওলগাকে আমি ছেড়ে যাই। তখন গিয়েছিলাম কাজের জন্য ঘুরতে। আমার পরম পূজনীয় সেই প্রফেসর ভরবিওভ দলটার নেতা ছিলেন। তিনি না থাকলে কখনোই যেতাম না। দুর্গ ইত্যাদিকে পরীক্ষা করা আর কী করে সেগুলোকে আরো শক্তিশালী করা যায় তা দেখার জন্য আমরা গিয়েছিলাম সীমান্তে। সেটা আমাদের নতুন সীমান্ত-প্রদেশ আর সেখানকার অবরোধ ব্যবস্থা ছিল একেবারে জঘন্য। প্রফেসর চটে উঠে আমাদের গালাগালি করেন, যেন সবকিছুর জন্য আমরাই দায়ী... একটা রিপোর্ট আর সবচেয়ে আগে কী কী ব্যবস্থা করা উচিত তার পরিকল্পনার কথা লিখে মস্কোতে ফেরার জন্য আমরা প্রস্তুত হই। মঙ্গলবার আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য একটা মোটরগাড়ির ব্যবস্থা করি আর যুদ্ধ শুরুর হয়ে যায় রবিবারে।

‘একটা লরি সীমান্ত-প্রদেশ রক্ষীদের বড়কর্তার পরিবার নিয়ে চলেছিল পেছন দিকে। সেই লরিতে আমাদের জায়গা হয়। এক ঘণ্টা যাবার পর রাজপথের বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে আমরা গিয়ে পড়ি। সবকিছুই আমাকে পাগল করে তোলে ... যে সব চাষী মেয়েরা আমাদের লরির সামনে গরু তাড়িয়ে নিয়ে চলেছিল, যুদ্ধ করার বদলে যে সব সৈন্যরা আমাদের সঙ্গে চলেছিল গাড়ি করে, জার্মান প্লেনগুলো থেকে আমাদের কেউ রক্ষা করেনি বলে আর আমাদের ভয়ংকর “নোয়া তরণীর” হাসিখুঁসি নেতার ভূমিকা অভিনয় করার জন্য প্রফেসর ভরবিওভকে বন্ধপরিচয় দেখা—সব কিছই! সব কিছই!

‘আমরা খুব ধীরে ধীরে এগোই। দ্বিতীয় দিনে আমাদের ঘটে ভয়ংকর বিপদ। সামনের রাস্তাটা বন্ধ করে দিয়েছে জার্মানরা। কয়েকটা পাগল শূরু করে গুলি ছুঁড়তে। প্রফেসর, তাঁর সহকারীরা আর একজন ইঞ্জিনিয়ার ছোট্ট বনের দিকে। আমি যেখানে ছিলাম সেখানেই থেকে যাই। হতভম্ব হয়ে লরিটার পিছনে বসে বসে দেখি আতঙ্কটাকে ছড়িয়ে পড়তে। আমার কাছে একটা রিভলভার ছিল। মদুহর্তের জন্য মনে হয়েছিল সবকিছু শেষ করে দিই। কিন্তু তারপর নিজেকে প্রশ্ন করি কেন আমি মরব? তার কারণ কি শূদ্ধ এই যে যাদের কাজ যুদ্ধ করা তারা যুদ্ধ করতে জানে না বলে? ঝোপের মধ্যে রিভলভারটা ছুঁড়ে ফেলে দিই।

‘জার্মানরা যখন লরির কাছে আসে আমি তখন লাফিয়ে নেমে জার্মান ভাষায় তাদের জানাই আমি কে। বলি আমি আত্মসমর্পণ করছি তাদের বিচারবুদ্ধি ও দায়িত্বের ওপর নির্ভর করে। তারা হেসে এগিয়ে যায়...

‘তারপর যা সব ঘটে সে কথা বলা অসম্ভব... প্রায় তিন বছর আমি থাকি POW শিবিরে। তিন বছর ক্রমাগত একমাত্র চেষ্টা করি বেঁচে থাকার। কয়েকটা পাগল বাধা দেয়। তাদের সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে ফাঁস দেওয়া হয়। আমার স্বপ্ন হয়ে দাঁড়ায় অদৃশ্য হয়ে যাবার। এইচ. জি. ওয়েল্‌স্-এর লেখা মনে আছে? কিন্তু সবাইকেই পায় তারা দেখতে। স্তালিনগ্রাদ যুদ্ধের পর বুনো পশুর মতো তারা হন্যে হয়ে ওঠে। স্তালিনগ্রাদ যুদ্ধের ঠিক আগেই আমার মাথায় বেশ একটা চালাকি বুদ্ধি খেলে। শিবিরের নেতা আর তার সহকারীদের ছবি আমি আঁকি। জানোই তো, ইস্কুলে ছবি আঁকার হাত আমার ভালো ছিল। সেটা বেশ কাজে লাগে। কাজ করা থেকে আমাকে নিষ্কৃতি দেওয়া হয়। প্রতিদিন নানা ফরমাশ আসতে থাকে ... কিন্তু স্তালিনগ্রাদ সবকিছু ভেঙে দেয়। যেদিন তারা খবরটা শোনে সেদিন তেল রঙগুলো আমার মুখে মাখিয়ে লাথি মেরে আপিস থেকে আমায় দূর করে দেয়। তারপর শুরুর হয়ে যায় সেই ভয়ঙ্কর হত্যালীলা। মারের চোটে, ক্ষিদেয়, টাইফাসে, সবকিছুতেই লোকে মরতে শুরুর করে ... এমন একটা দিন এসে পড়ে যখন আমি আর সহ্য করতে পারি না।

ফলে শিবিরের নেতার কাছে একটা আবেদন লিখি। তাকে অনুরোধ করি আমি কোথায় আছি এক ইঞ্জিনিয়ার জেনারেলকে জানাতে। সেই জেনারেল ফেরো-কংক্রিট সম্বন্ধে এক বিশেষজ্ঞ জার্মান। বলি আমি প্রফেসর ভরবিওভের সহকারী। কথাটা মিথ্যে — আমি ছিলাম শূন্যই তাঁর ছাত্র। কিন্তু তাতে ফল হয়। দশ দিন পরে আমার ডাক পড়ে। একটা গাড়িতে করে আমায় নিয়ে যাওয়া হয় বার্লিনে। সেখানে আমার খাওয়া পরার ব্যবস্থা করা হয় আর তারপর আমায় নিয়ে যাওয়া হয় সেই জেনারেলের কাছে ... মিনিট পাঁচেক আমার সঙ্গে সে কথা বলে। তারপর এ বিষয়ে আমার জ্ঞান আছে দেখে সন্তুষ্ট হয়ে সে বলে, “আমার হেডকোয়ার্টার্সে তুমি থাকবে। সৌভিয়েত ফেরো-কংক্রিট নির্মাণ সম্পর্কে আধুনিকতম আবিষ্কারের কথা যা জানো সব লিখবে। একমাস তোমায় সময় দিচ্ছি ...” বত্রিশ দিন কেউ আমায় জ্বালাতন করেনি, আমি লিখেছিলাম ... জার্মান ইঞ্জিনিয়াররা ঠাট্টা করে বলত যে আমার মূল্যবান তথ্য না পেলে তারা রুশিদের খুব সম্ভব ঠেকাতে পারবে না। বলত আমায় তাড়াতাড়ি করতে ... অবশেষে এক মোটা গোছের পাণ্ডুলিপি তৈরী হল। জেনারেলকে সেটা দিলাম। আমার সঙ্গে সে খুব ভালো ব্যবহার করে। কিন্তু এক সপ্তাহ পরেই আমায় সে ডেকে পাঠায় ... আমার লেখা কাগজগুলোর ওপর আঙুল দিয়ে এমন ভাবে চিৎকার করে সে আমায় গালাগালি করে যেন আমি একজন আদর্শ। জানতে পারি যা কিছু লিখেছি তার

সবটাই রাবিশ। জানতে পারি এর সব কথা অনেকদিন আগেই তাদের জানা। আমাকে বলা হয় যে-বাজে কথাগুলো লিখেছি তার চেয়ে ভালো জিনিস দিয়ে স্থালিনগ্রাদের প্রতিরোধ ব্যবস্থা করা হয়েছে, ইত্যাদি ইত্যাদি... আমি বলি যে ফেরো-কংক্রিট সম্বন্ধে কোনো নতুন আশ্চর্য আবিষ্কার হতে পারে না। বলি যে নিশ্চয়ই একেবারে কোনো নতুন জিনিস স্থালিনগ্রাদে ব্যবহার করা হয়েছে। জেনারেল আমাকে ন্যালাক্ষ্যাপা বলে তার আপিস থেকে তাড়িয়ে দেয়। সেই দিনই আমি ফিরে আসি শিবিরে। যতদিন না আমেরিকানরা আসে ততদিন সেখানে থাকি... আমি কে জানতে পেরে তারাও আমাকে একটা কাজ দিতে চায়। কিন্তু আর কোনো বুর্জিকি নিতে রাজি হই না। তাই তাদের প্রস্তাব উপেক্ষা করে সদরু করি দেশে ফেরার উপায় খুঁজতে...

‘সোভিয়েত এলাকায় পের্ণেছে সব কথা স্বীকার করি। যে মেজর আমায় প্রশ্ন করছিলেন তিনি আমার সঙ্গে ভারি রুঢ় ব্যবহার করেন। কয়েকজন লোকের সামনে আমাকে তিনি বলেন ঘৃণ্য জীব। তারপর একটা শিবিরে পাঠান। সেখানে থাকত যত রাজ্যের বদমাইস — জার্মান পদলিখ বিভাগে যারা কাজ করেছে, খুদুনে, চোর ইত্যাদি। সেটা ভীষণ জায়গা। প্রথম দিনই তারা আমার জ্যাকেটটা চুরি করে... কপাল ভালো, আমি কে সেটা বদ্বতে কর্তৃপক্ষের দেরি হয়নি... সেই মেজরই আমাকে শিবির থেকে ডেকে পাঠিয়ে মস্কোতে যাবার এক ছাড়পত্র দেন...

‘এই ভাবে এখানে আমি আসি। পয়লা নম্বর খবর ওলগা নেই। একবছর আগে আবার সে বিয়ে করেছে। অপেক্ষা করতে পারেনি সে। অপেক্ষা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল... কিন্তু তাকে আমি খুঁজে বার করি। জানি না কেন, কিন্তু তাকে আমি সব কথা বলি। সে কাঁদে, কিন্তু জানায় আমার কাছে আর ফিরতে পারবে না... আরও মজার কথা — আমার কষ্টও হয় না, দুঃখও হয় না। শূদ্ধ হয় রাগ — প্রত্যেকের ওপর রাগ। রাগ হয় জীবনের কাছ থেকে যা পেয়েছি তার জন্য ... দু নম্বর খবর আসে সচি থেকে। মার সম্বন্ধে যে খবরাখবর করি তার উত্তরে। ১৯৪৪-এ তিনি মারা গেছেন। আমার ইনস্টিটিউটে যাই, কিন্তু তারা আমার সঙ্গে এমন ভাবে কথা বলে যে আর কখনো সেখানে যাব না। তারপর ওলগা আসে আমার কাছে। সে বলে এমন অসহায় অবস্থায় সে আমাকে ফেলে যেতে পারে না। সে স্থির করেছে ফিরে আসবে। দয়া দেখায় সে। কিন্তু তার দয়ায় আমার দরকার নেই! আমি রাজি হই না। দয়ায় আমার দরকার নেই...

‘এই হল সব কথা। প্রফেসর ভরবিওভের কী হয়েছিল? পার্টিজানদের হয়ে যুদ্ধ করে তিনি মারা যান ... এখন আমি কী করছি? ইনসিউরেন্সের হয়ে কাজ করছি। খারাপ শোনাচ্ছে কী? লাইফ ইনসিউরেন্সের দালাল ... তুমি ইনসিউর করতে চাও?.. সম্পত্তিরও ইনসিউর করার ব্যবস্থা করতে পারি... কিন্তু আমার নিজের জীবনটা ইনসিউর করা নেই... ভালো

কথা, কেন তুমি ইনসিউর করাচ্ছে না? সবচেয়ে ভালো সতর্ক?’

‘না, ধন্যবাদ ...’ উঠে পড়লাম। বিদায় না জানিয়েই এলাম বেরিয়ে।

তার সম্বন্ধে কী ভাবছি সে কথা মুখের উপর না বলার জন্য বেশ কষ্ট করতে হয়েছিল।

এই গল্পটার খসড়া তানিয়া আর ভালেস্তিনকে পড়ে শোনাই। ভালো করে বুঝতে পারি না আমাদের উঠনের ছেলেদের নিয়ে বই-এর মধ্যে এটাকে দেওয়া ঠিক হবে কি না।

ভালেস্তিন খানিক ভেবে বলে:

‘রম্মেইকো যদি শেষ পর্যন্ত ভালো হয়ে উঠত তাহলে অবশ্য ভালো হত। কিন্তু তা সে হয়নি! দোষটা কি একা শুদ্ধ তার? আমার মনে হয়, আমাদের মধ্যে কোথায় পচ ধরেছে, সময়মত সেটা না দেখতে পাওয়ার জন্য সবাই আমরা দায়ী ... কিন্তু এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই যে অধিকাংশ দোষটা তার নিজের। সে বাঁচত শুদ্ধ নিজেরই জন্য। হতভাগাটা। একেবারে স্বার্থপর, ভয়ানক স্বার্থপর। তার জীবনের গল্পটা ভালো একটা শিক্ষা হবে। এটা পড়লে লোকে অনেক কথা ভাববে। যাই বলো না কেন, স্বার্থপরতা এখনো আমাদের মধ্যে রয়েছে।’

‘আমার কিন্তু মনে হয় এটা আমাদের উঠনের পক্ষে একটা লজ্জার কথা!’ তানিয়া বলল উত্তেজিত হয়ে।

‘শোনো তানিয়া, আমাদের উঠনটাই আমাদের সমস্ত দেশ,’ মৃদু হাসল ভালেস্তিন। ‘আমাদের উঠনটাকে পরিস্কার করে রাখতে হবে। সেখান থেকে তাড়াতে হবে স্বার্থপর লোকদের।’

উঁচু পাহাড়ের পাদদেশে

তলিয়া শ্বেচর্বাভ ... ভারি স্পর্শ আমার মনে পড়ে কথাটা যেন কুড়ি বছর আগের নয়, গতকালেই ঘটেছে। সে আমার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। শরীরটা তার বেঁটে খাটো শক্তসমর্থ। দাঁড়িয়ে রয়েছে তার বেঁটে বেঁটে মাংসপেশী বহুল পা দুটো ফাঁক করে। এইমাত্র পাশের ফ্ল্যাট-বাড়ির ছেলেদের সঙ্গে একটা তুমুল যুদ্ধে আমরা হেরে গেছি। আমাদের তলিয়া আর্থিপভের চোখের তলায় একটা বড় গোছের কালশিটে পড়তে শুরু করেছে। এই যুদ্ধে আমাদের দরকার ছিল প্রত্যেকটি যোদ্ধার। কিন্তু তনিয়ার ভাষায়, তলিয়া “যে ভাবে লড়েছে তাতে সে অন্য কোথাও থাকলে ক্ষতি ছিল না।” সদার হিসেবে আমার মনে হচ্ছে এই পরাজয়ের কারণটা তদন্ত করে, যারা দায়ী তাদের নামে কলঙ্ক দিতে বাধ্য। তাই তলিয়াকে রেগে প্রশ্ন করলাম;

‘তোর মনে হয় না, এবার ভাঁড়ামি বন্ধ করার সময় হয়েছে?’

সরল চোখে আমার দিকে সে তাকাল, কিন্তু তার হাসির মধ্যে ফুটে উঠল বিদ্বেষ।

‘আমাদের চেয়ে সংখ্যায় ওরা অনেক বেশি ছিল। তাই ওদের কোনো কৌশলে হারানো যায় কি না তার উপায় খুঁজে বের করার চেষ্টা করছিলাম।’

‘কী কথা! ও ভাবছিল!’ কাছে আসতে আসতে গজগজ করে বলল ভালিয়া আখিঁপভ। লজ্জার ভঙ্গিতে একটা হাত তার চোখের তলাকার কালশিটের উপর। কিন্তু বীরত্বের এই চিহ্নটা তাকে নিষ্ঠুর হবার পূর্ণাধিকার দিয়েছে... ‘ও ভাবছিল, কিন্তু যুদ্ধ করবে কে? ওর মামা?’

ভালিয়া চুপচাপ। যেন ময়দায় ঢাকা শাদা পল্লবের ছায়া পড়ছে তার চোখে।

ভালিয়া তাকে কড়া কড়া কথা বলে চলল, ‘দেখ একবার ওর দিকে। আমরা যখন লড়ছি ও তখন ভাবছে। কার ওপর ও নির্ভর করেছিল? ওর মামার ওপর?’

ভালিয়া যখন তৃতীয় পুরুষ একবচনে কথা বলে আর ক্রমাগত উল্লেখ করে “ওর মামা” তার মানে রাগে সে টগবগ করছে। যে কোনো কাণ্ড সে তখন করে ফেলতে পারে।

‘আমার ইচ্ছে করছে তোকে আচ্ছা করে...’ রাগে তার গলাটা বন্ধে গেল।

‘তাই দে,’ নম্রস্বরে বলল তলিয়া। তাতে ভালিয়ার রাগ পড়ে গেল।

‘আমি বদ্বি না তোকে কেন আমরা বরদাস্ত করি,’ একপাশে যেতে যেতে বলল সে।

‘বরদাস্ত করিস না,’ শান্তভাবে জবাব দিল তলিয়া।

যেতে যেতে ভালিয়া থেমে গেল। মনে হল তলিয়া বড় বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে, এক্ষুনি মজাটা টের পাবে। কিন্তু সেই মদহর্ভে তলিয়া নীচু হয়ে কৃত্রিম তাম্বিল্য ভরে একটা টিল তুলে নিয়ে খাড়া বাঁকা রেখায় সেটা ছুঁড়ল। আমরা সবাই দেখতে লাগলাম পাঁচ তলা ফ্ল্যাট-বাড়ির উপরে টিলটাকে উঠতে আর লোহার ছাদের উপর পড়তে ঝনঝন করে। যাই বলো না কেন এ পাড়ার কেউই তলিয়ার চেয়ে উঁচুতে টিল ছুঁড়তে পারে না।

‘মেয়েদের তুই তোর কায়দাটা দেখাগে যা,’ ভালিয়া বলল। কিন্তু তখন আর তার গলায় রাগ বা বিদ্বেষের স্বর নেই — তলিয়ার টিল ছোঁড়াটা সেও তারিফ করে।

... তলিয়া মনস্থির করে ফেলেছিল ডিটেকটিভ হবে। কী করে কথাটা যে তার মাথায় এসেছিল জানি না। কিন্তু তার একগুঁয়ে মগজে সেটা আটকে গিয়েছিল। তার ঠাট্টার নাম “টেক”এর জন্য সে গর্ব বোধ করত। আসল নামের চেয়ে ঐ নামে ডাকলে উত্তর দিত সে চটপট... তখনকার দিনে খবরের কাগজে অপরাধের কথা প্রতিদিন ছাপা হত। সব অপরাধগুলোর

কথা আদ্যোপান্ত সে জানত। কিন্তু সেই সংক্ষিপ্ত বিবরণগুলোর মধ্যে সে যতটা চাইত ততটা খুঁটিনাটি থাকত না। তাই আমাদের সে যখন অপরাধের গল্পগুলো বলত তখন এমন খুঁটিনাটি কথা যোগ করে দিত যে আমরা খাড়া হয়ে হাঁ করে বসে শুনতাম। তলিয়া বলত যে কমারভ নামে মস্কার শ্রেষ্ঠ ডিটেকটিভের সঙ্গে তার আলাপ আছে। প্রত্যেকটি অমীমাংসিত অপরাধমূলক গল্পের শেষে পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে এই কথাগুলো সে যোগ করে দিত:

‘ভাবিস না, এর সমাধানও নিশ্চয়ই কমার করবেন...’

মাঝে মাঝে তার অনেক গল্প শোনার পর স্বপ্নে আমি দেখতে পেতাম এই চতুর কমারকে। হাতে তাঁর একটা রিভলভার। পীচের মতো অন্ধকার একটা বিরাট চিলেঘরে এক গয়নার দোকানের ক্যাসিয়ারের হত্যাকারীদের কাছে এগুচ্ছেন অলক্ষ্যে আর সাবধানে।

দ্বিওখগর্নায়া কাপড়-মিলের ফোরম্যান ছিলেন সেগেই সেগেয়েভিচ, তলিয়ার বাবা। তাঁর জন্ম এক মজদুর বংশে। কাপড়ের কারখানায় অনেক পুরুষ ধরে তাঁদের অভিজ্ঞতা। তার মাও কাজ করতেন সেই মিলে, বোনার বিভাগে। তলিয়ার বাবাকে আমরা বেশ পছন্দ করতাম কারণ আমাদের সঙ্গে তিনি সমবয়সীর মতো ব্যবহার করতেন। প্রায়ই আমাদের সঙ্গে তিনি আলোচনা করতেন, জিগগেস করতেন অন্য ছেলেদের সঙ্গে আমাদের মারামারির কথা আর দিতেন উপদেশ। মিল

থেকে তিনি আমাদের জন্য নিয়ে আসতেন সুন্দর সুন্দর কাঠিম। সেগুদুলো দিয়ে আমরা তৈরি করতাম চমৎকার বাঁশি। ওগুদুলোর শব্দ খুব তীক্ষ্ণ। তিনি একবার আমাদের বুদ্ধি দিয়েছিলেন প্রত্যেকে একটা করে বাঁশি নিয়ে নির্ধারিত সঙ্কেতের পর “কান ফাটানো রক্ত-হিম-করা” শব্দে বাজিয়ে শত্রুকে আক্রমণ করতে। ঐ কান ফাটানো রক্ত-হিম-করা কথাগুদুলো তাঁর। তাঁর কথা মতো আমরা কাজ করি আর তার জন্য আমাদের অনুশোচনা করতে হয়নি: শত্রুদের আমরা হাত-পা বেঁধে ফেলতে পারতাম এমন হকচকিয়ে গিয়েছিল তারা... বেড়ার ওপাশ থেকে দৃশ্যটা দেখতে দেখতে হাসির চোটে সেগেই সেগেয়েভিচের চোখে জল এসে গিয়েছিল ...

প্রথম যখন আমরা বলাবলি করতে শুরু করি বড় হয়ে আমরা কী হব তখন আমাদের কারুর সঙ্গে কারুর উচ্চাশাটা মিলত না। ফেদিয়ার উদাহরণ দেখে যখন আমরা সবাই মনস্ত্বির করে ফেলি যে ড্রাইভার হব, এমন কি তখনো তলিয়া আমাদের এক রোমাঞ্চকর বর্ণনা দেয় মোটরগাড়ি করে অপরাধীকে তাড়া করার। তারপর হঠাৎ বলল:

‘অপরাধীদের তাড়া করার ইচ্ছেটা আমার খুব, কিন্তু তবু আমি চব্বিশ ঘণ্টার ডিটেকটিভ হব না,’ কথাটা সে স্বীকার করল। ‘বাবার মতোই আমি হব ফোরম্যান। আমার ঠাকুর্দা

ছিলেন ফোরম্যান, আমার বাবা ফোরম্যান, আমিও ফোরম্যান হব। অবসর সময়ে আমি ডিটেক্টিভ।’

... উঠনের এক কোণে এক গাড়ি ভর্তি সবে-কাটা তন্তু গাদা করা ছিল কোনো সারাবার কাজের জন্য। এক সার চড়ুই পাখীর মতো তন্তুগদুলোর উপর বসে আমরা শুনছিলাম তলিয়ার কথা। সে বলছিল অদম্য কুমারের অসমসাহসিক বীরত্বের আর একটা কাহিনী। এবার কিন্তু সে গল্পটা তেমন জমিয়ে বলতে পারেনি। গল্পটা এমন জটিল করে বলে যে শেষটায় ফেলে একেবারে গুলিয়ে। প্রথম আপত্তি জানাল তানিয়া।

সে হেসে বলল, ‘টেক, তুই যা বলছিস সেটা একেবারে এলোমেলো। গোড়ায় বলেছিলি ড্রাইভার মিথফানভকে ছুরি মেরে খুন করা হয়েছে। আর এখন সে দিচ্ছে সাক্ষী!’

অন্যমনস্কভাবে তানিয়ার দিকে তলিয়া তাকিয়ে আমতা আমতা করে উঠল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে সামলে নিল।

‘ছুরি মারা হয়েছিল কিন্তু মরেনি। ওরকম ঘটনা ঘটে ...’ সহজ সুরে সে বলল। ‘বাধা দিস না!’

কিন্তু গল্পটা সে আর বলল না। স্পষ্টই মনে হল সে এমন তালগোল পার্কিয়ে ফেলেছে যে আর সামলাবার আশা নেই।

‘গল্পটা তুই শেষ করবি, না কী?’ তানিয়া বলল খোঁচা দিয়ে।

‘না,’ সোজা সে উত্তর দিল।

‘অন্তত তুই মিথফানভকে মরিয়ে দে। বেচারার রক্ত ঝরছে, যন্ত্রণা পাচ্ছে সে — এটা ঠিক নয়...’

তানিয়া চুপ করে রইল। তার গোলাপী গালদুটো হয়ে উঠল টকটকে লাল। হঠাৎ তড়াক করে লাফিয়ে নেমে মারমুখো হয়ে দাঁড়িয়ে সে বলল:

‘তোরা ভাবিস কী? টেক পারে না এমন কাজ নেই! একটাও সে রকম কাজ নেই! ডিটেকটিভ পারে বাঁ হাতে গুলি ছুঁড়তে, মদ খায় কিন্তু মাতাল হয় না, যে কোনো তালাও সে খুলতে পারে!’

‘আর পারে ভালো গল্প বলতে,’ বিদ্রূপের সুরে যোগ করে দিল তানিয়া।

‘তোরা তো জার্নিস কমার একবার কী করেছিল?’ তানিয়ার কথায় কান না দিয়ে তানিয়া বলে চলল। ‘ড্রেন পাইপ বেয়ে একবার সে উঠেছিল দশ তলা বাড়ির একটা ছাদে।’

‘তুই তা পারিস?’ কৃত্রিম বন্ধুত্বের সুরে তানিয়া প্রশ্ন করল। তানিয়া শান্ত হওয়ায় খুঁসি হয়ে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল তানিয়া:

‘নিশ্চয়ই পারি...’

‘কখনো পারিস না,’ নকল উদাস স্বরে বলল কলিয়া লাস্কির্ক। ‘তোরা মতো ছিঁচকাঁদুনে ছেলেরা পারে না...’

কথাটার উত্তর না দিয়ে তলিয়া তাকাল ঘৃণা ভরা দৃষ্টিতে লাস্কির্কর দিকে। তারপর গেল সবচেয়ে কাছের ড্রেন পাইপের দিকে। চুপচাপ তাকে আমরা লক্ষ্য করতে লাগলাম। পাইপটার কাছে পৌঁছে তলিয়া জুতো খুলে হাতের তালুতে থু-থু মাখিয়ে লাফিয়ে সেটা ধরে উঠতে শুরুর করল ব্যাঙের মতো পা নাড়িয়ে। ব্যাপারটা যে কত বিপজ্জনক তা প্রথমে আমরা লক্ষ্য করিনি। টেক যখন তেতলায় পৌঁছল আর আমরা যখন দেখতে পেলাম ব্র্যাকেটটার মধ্যে পাইপটা নড়বড় করছে তখন বদ্বাংতে পারলাম তার বিপদটা।

‘নেমে আয়!’ ভাঙা গলায় আমি চিৎকার করে উঠলাম।

তলিয়া আমার হাতটা চেপে ধরল। ‘চেচাঁসনি — তোরা চেঁচানি শুনে ভয় পেয়ে ও পড়ে যাবে...’ ফিসফিস করে মোটা গলায় সে বলল।

ড্রেন পাইপটা একেবারে নড়বড়ে। বহুকাল থেকে সেটা আর কাজ করে না। বর্ষায় সেটা একেবারে অকেজো। দেয়াল বেয়ে জল পড়ে। বাড়ির ম্যানেজার তা দেখে সবসময়ই অবাক হয় ...

তলিয়া এখন চার তলায় পৌঁছেছে। আর একটা তলা মাত্র বাকি। কী করছি সে কথা ভুলে দাঁড়িয়ে উঠে রুদ্ধ নিশ্বাসে আমরা দেখতে লাগলাম তলিয়াকে উঠতে। তানিয়াই শুদ্ধ দেখাল একটা উদাসভাব। থেকে থেকে সে গজগজ করতে

লাগল যদিও মাঝে মাঝে তার দাঁতে দাঁত লাগার শব্দ স্পষ্টই
ষেতে লাগল শোনা।

তলিয়া এখন খুব ধীরে ধীরে উঠছে। অবশেষে প্রায় যখন
ছাদের কাছে পৌঁছেছে একটা পা দিয়ে পাইপটাকে জড়িয়ে
সে চট করে ধরল তার উপরটা। জোরে মট করে একটা শব্দ
হল। আর পরের মূহুর্তে আমরা দেখলাম ফানেলটা পড়ছে
নীচের দিকে। আমরা চোখ বন্ধ করলাম। আবার যখন
তাকালাম দেখি তলিয়া শূন্যে ঝুলছে। দু'হাত দিয়ে বাড়ির
কাণিঁশটা ধরে পা দিয়ে সে ঝুঁজছে সবচেয়ে ওপরকার
ব্র্যাকেটটা। কিন্তু পা রাখার জায়গা ঝুঁজে না পেয়ে সে ঝুলে
রইল স্থিরভাবে। আমরা জানতাম ওভাবে সে বেশিক্ষণ থাকতে
পারবে না। হঠাৎ তার শরীরটা ঝাঁকানি দিয়ে উপরদিকে উঠল।
তার কনুইটা চলে গেল গাটারের প্রান্তদেশে। পর মূহুর্তে সে
ছাদের উপর উঠে... অদৃশ্য হয়ে গেল।

‘ওঃ! সত্যি ও উঠল তাহলে!’ কলিয়া লাস্কিঁক দীর্ঘ শান্ত
নিশ্বাস ফেলে বলল। তার গলায় এমন একটা সুর ফুটে উঠল
যেন নিজেই সে উঠতে পেরেছে। তলিয়া আঁখিপাত তখনো
উপর দিকে তাকিয়ে। তার চওড়া কপালে ঘামের বড় বড় ফোঁটা
চকচক করছে। তানিয়া হঠাৎ ইমার্জেন্স-মইটার দিকে ছুটে
গিয়ে বেড়ালের মতো দ্রুত পায়ে উঠতে শুরু করল। এক
মিনিট পরে সে অদৃশ্য হল কাণিঁশের ওপাশে। বাদবাকি সবাই
তখনো দাঁড়িয়ে উপর দিকে চেয়ে।

‘চলে আয়!’ ভালিয়া চেঁচিয়ে বলে ছুটে গেল মইটার দিকে।

ছাদে আমরা যা দেখলাম সেটা বাস্তব বলে মনে হল না—
তানিয়ার কোলে মাথা রেখে তলিয়া শূয়ে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে
কাঁদছে, কেঁপে কেঁপে উঠছে তার শরীরটা। তানিয়া তার
মাথায় হাত বোলাচ্ছে। সেও কাঁদছে নিঃশব্দে। ভ্যাবাচ্যাকা
থেয়ে আমরা দাঁড়িয়ে রইলাম, বদ্বতে পারলাম না কী
করব। তলিয়া মাথা তুলল। আমাদের দেখে সে হাসল
সলজ্জভাবে।

‘কিছু হয়নি—এক মিনিটেই সব ঠিক হয়ে যাবে...’ সে
বলল।

আমরা সবাই একমত হলাম যে কথাটা বড়দের বলা হবে
না। কিন্তু কী জানি কী করে অল্প পরেই সেগেই সেগেয়েভিচ
কথাটা জানতে পারলেন। তলিয়ার বাবা বেরিয়ে এসে জানতে
চাইলেন কী করে ব্যাপারটা ঘটে। অত্যন্ত এলোমেলোভাবে
তাঁকে ব্যাপারটা জানানো হল। সেটার দরুন কিন্তু সম্পূর্ণ
দোষটা পড়ল কলিয়া লাস্কির ঘাড়ে। আর সবচেয়ে যেটা
আশ্চর্য কলিয়া সেটা মেনে নিল। তারপর সেগেই সেগেয়েভিচ
ড্রেন পাইপটার কাছে গিয়ে সেটা ছুঁয়ে ওপরদিকে তাকিয়ে
মাথা নেড়ে এগুলেন তলিয়ার দিকে। খানিক দূরে তলিয়া
দাঁড়িয়েছিল মাথা নীচু করে। ‘বেচারি, এই বার ওর হবে,’ আমি
ভাবলাম। তলিয়ার জন্য ভারি দঃখ হল আমার। কিন্তু সেগেই

সেগেয়েভিচ যা করলেন সেটা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত—তলিয়াকে জড়িয়ে ধরে কাছে টেনে নিয়ে তার কপালে চুম্ব খেলেন। বললেন:

‘বাহাদুর ছেলে! বাপকা ব্যাটা। কিন্তু আর ড্রেন পাইপ নয়। ব্লুয়েছো?’

‘হ্যাঁ,’ ফিসফিস করে বলল তলিয়া।

...আর একটা ঘটনা। একই সঙ্গে আমরা সবাই যোগ দিই ইয়াং পাইয়োনায়ার দলে। এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে আমাদের দল যে বাহিনীতে যোগ দেয় তাতে সেটার বিশেষ কোনো উপকার হয়নি। আমরা সঙ্গে করে এনেছিলাম আমাদের উঠনের দ্দুদাস্ত খোলামেলা ভাবটা। ফলে ইয়াং পাইয়োনায়ার পরিষদের প্রতিটি বৈঠকে আমাদের যে কোনো একজনের আচরণ সম্বন্ধে কোনো না কোনো মন্তব্য করত। কিন্তু আমাদের পাইয়োনায়ার নেতা সেগেই কলস্কভ আমাদের সঙ্গে ব্যবহারে ছিলেন সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি। নিশ্চয়ই আগে থেকে তিনি জানতেন কী ভাবে আমরা গড়ে উঠব... অন্তত আমাদের উঠনের বাইরে দলের ছেলেদের উপর আমাদের সর্দারি করার অধিকার ত্যাগ করার মতো কঠিন কর্তব্যের সম্মুখীন হতে হয় তলিয়া আর্থিপভ আর আমাকে। অল্পদিনের মধ্যেই আমাদের উপর পাইয়োনায়ার নেতার প্রভাবটা ছড়াতে শুরু করে। সেটা যে কী ভাবে ছড়ায় তা আমরা লক্ষ্য করিনি। নিশ্চয়ই তিনি খুব

চালাক ছিলেন। কারণ অল্পদিনের মধ্যেই আমাদের উঠনে ক্রমশ ঘনঘন শোনা যেতে লাগল এই ধরনের কথা:

‘সেগেইকে আমরা জিগগেস করব...’

‘সেগেই ওটা বরদাস্ত করবেন না...’ ইত্যাদি ইত্যাদি।

আর একটি ক্ষমতার কাছেও আমরা বশ্যতা স্বীকার করি। আগে সেটাকে জানতাম না। এবারেও বশ্যতা স্বীকার করি নিজেদের অজান্তে। সেই ক্ষমতাটি হল দলের নিয়মানুবর্তিতা। পাইয়োনায়ার হিসেবে আমরা যা কিছু করতাম আমাদের কাছে তা হয়ে উঠল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের মধ্যে জাগল সমাজ-চেতনা। পাইয়োনায়ার হওয়ায় আমাদের উঠন এবং আমাদের ইন্সকুলের বাইরেরও নানা বিষয়ে আমরা হয়ে উঠলাম অত্যন্ত উৎসাহী...

একবার আমাদের দল ইলিন্সকয়ে-তে বেড়াতে যায়। আমার মনে আছে বনের মধ্যে যেতে যেতে ভালিয়া আমাকে বলে:

‘গোটা মাসের মধ্যে আমাদের একজনও কত’ব্যকাজে ফাঁকি দেয়নি! অদ্ভুত, না?!’

... কিন্তু সেদিনেই ঘটল আর একটা স্মরণীয় ঘটনা ... বনের মধ্যে প্রচুর ঘোরাঘুরি করার পর আমরা বনফায়ার ঘিরে বসলাম সেগেই কলস্কভের গল্প শুনতে। তিনি আমাদের বলছিলেন রাজলিভ স্টেশানের কাছে এক কুণ্ডে ঘরে ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের লুকিয়ে থাকার সময়কার কথা। তারপর এই

বেড়ানোর ব্যাপারটাকে আমরা শেষ করলাম নদীতে সাঁতার দিয়ে। আমাদের মধ্যে অনেকে সাঁতার জানত না। চার জন করে এক একটি দলে আমাদের ভাগ করা হল। প্রতি দলেরই ভার এমন একজনের উপর রইল যে সাঁতার জানে...

আমার উপর যাদের ভার নদীতীরে তারা বসল তলিয়ার দলের পাশে। আমার কপালটা ভালো ছিল—যে তিনটি ছেলের ভার আমার উপর জলে তাদের এমন ভয় যে তীর থেকে তাদের একগজ দূরেও সরানো গেল না। আমি না থাকলে তারা সম্পূর্ণ নিরাপদ, এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়ে আমি সাঁতরে গেলাম মাঝ নদীতে। হঠাৎ শূন্যতে পেলাম এক ভয়ঙ্কর চিৎকার:

‘গেনিয়া ডুবে গেছে! গেনিয়া ডুবে গেছে!’

মাত্র এক মিনিট আগেও ছেলোটিকে আমি দেখেছিলাম। সে তলিয়ার দলের। দেখেছিলাম তাকে সামান্য ছুটে এসে আনাড়ির মতো নদীতে ঝাঁপ দিতে... জল ভেঙে আমি এলাম। চেঁচিয়ে ছিল দুটি ছেলে। তারা ছুটে যাচ্ছিল তীরের দিকে। এক মিনিটের মধ্যে তারা তীরে পৌঁছে অদৃশ্য হয়ে গেল। তলিয়ার কোনো চিহ্ন নেই। সেই মারাত্মক জায়গাটার দিকে আমি সাঁতরে চললাম।

প্রাণপণে সাঁতার দিলেও খুব তাড়াতাড়ি যেতে পারলাম না। কারণ ভয়ে আমার হাতদুটো অসাড়।

তারপর ঢালু জায়গাটার চুড়ায় দেখা দিলেন সেগেই

কলস্কভ। পরনে তাঁর পুরো পোষাক। সে অবস্থাতেই তিনি জলের মধ্যে ঝপঝপ করে কয়েক পা গেলেন। তারপর ডুব দিয়ে তুললেন নিষ্প্রাণ একটি দেহ। ততক্ষণে আমি সে জায়গাটায় পেঁছেছি। দ্বুজনে ধরাধরি করে তীরে নিয়ে এলাম সেই পিছল ঠান্ডা দেহটিকে। হঠাৎ কাছে ঝোপের ডালপালাগুলো মটমট করে উঠল আর ঝোপের ভিতর থেকে কামানের গোলার মতো বেরিয়ে এসে কে একজন ঝাঁপ দিল জলে। সে তলিয়া।

তারপর ঢালু জায়গা থেকে শোনা গেল একটা মোটরগাড়ির হর্ণ। সেই গাড়ি থেকে লাফিয়ে নামলেন শাদা সামরিক টিউনিক পরা মোটাসোটা এক লোক আর যে দুটো ছেলে দৌড়ে চলে গিয়েছিল তারা। সৈনিকটি গেনিয়ার উপর ঝুঁকে পড়ে সময় নষ্ট না করে সঙ্গে সঙ্গে শূরু করে দিলেন কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস। তলিয়া কাছে দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপছে। তার মুখটা গেনিয়ার মতোই নীল।

একটা অলৌকিক ঘটনা ঘটল—অন্তত তাই আমার মনে হল। গেনিয়ার প্রাণ ফিরে এল। সে শূরু করল অনিয়মিতভাবে নিশ্বাস নিতে।

‘ওকে গাড়িতে নিয়ে চলো!’ লোকটি হঠাৎ আদেশ দিলেন। গেনিয়াকে আমরা ধরাধরি করে গাড়িতে শোয়ালাম। আমরাও উঠলাম। গাড়িটা ছাড়ার সময় শেষ দেখতে পেলাম তলিয়ার ঝুঁকে-পড়া চেহারাটা, তার পিছনে নদীর জল।

... পাইয়োনিয়ার পরিষদের পরের সভায় আনাতলি শেচবাকভের ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা হল। আলোচনাটা হল প্রত্যেক সদস্যের উপস্থিতির মধ্যে। শূদ্ধ গেনিয়া ছিল না। সে তখনো হাসপাতালে। আমাদের দলের সব ছেলেরা এই কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে তলিয়ার হয়ে কেউ কিছু বলবে না। পিছনের সারিতে আমরা বসলাম। আরো পিছনে বসেন তলিয়ার বাবা, সেগেই সেগেয়েভিচ। নাভাস হাতে ক্রমাগত তিনি তাঁর টাইটার উপর হাত বোলাচ্ছেন।

ঘটনার কথা সংক্ষেপে জানালেন সেগেই কলস্কভ। তলিয়া সম্বন্ধে তিনি বেশ কয়েকটা কড়া কথা বললেন:

‘কমরেডকে বিপদের মধ্যে ফেলে যাওয়ার চেয়ে কোনো তরুণ পাইয়োনিয়ারের পক্ষে খারাপ কাজ আর কী হতে পারে?’

নেতার দৃঢ় অনুরোধ সত্ত্বেও বেশ খানিকক্ষণ কেউ বক্তৃতা দিতে উঠতে চাইল না। তারপর আমার অচেনা একটি মেয়ে বিব্রতভাবে মুখ লাল করে জানতে চাইল কেন শেচবাকভ ছেড়ে চলে গিয়েছিল যাদের উপর তার ভার ছিল তাদের।

তলিয়া দাঁড়াল। বলল:

‘একটা সন্দেহজনক লোক কাছে ঘূরঘূর করছিল। তাই ভেবেছিলাম খানিক তার পিছন নেব — তখনই ব্যাপারটা ঘটে ...’

প্রত্যেকে হেসে উঠল। টেকে শূদ্ধ আমরা চিন্তাম, তাই

আমরা হাসলাম না। তারপর সেগেই সেগেয়েভিচ বক্তৃতা দেবার অন্তিমতি চাইলেন। সভাপতির টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি বক্তৃতা দিতে শুরু করলেন না। প্রথমে তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন শ্রোতাদের দিকে, যেন তাদের মেজাজটা বদ্বাতে চান। “কোনো প্রতিনিধি,” কে একটি মেয়ে জোরে ফিসফিস করে বলে উঠল।

তিনি বলতে শুরু করলেন, ‘না বাছা, আমি কোনো প্রতিনিধি নই। আমি শেচবাকভের বাবা... এই কথাটা তোমাদের বলতে চাই। আমার ছেলে এমন ভয়ানক অন্যায় করেছে যে তোমাদের দিকে তাকাতে আমার লজ্জা করছে। সত্যিই বলছি ...’

তলিয়া সম্বন্ধে আর কোনো কথা তিনি বললেন না। কিন্তু কমরেডের কর্তব্য সম্বন্ধে অনেক কথা বললেন। আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাঁর গল্পটা শুনতে লাগলাম—জারের সৈন্যদলে যখন তিনি সাধারণ সৈনিক ছিলেন তখন এক যুদ্ধে গুরুতরভাবে আহত হবার পর কী করে নিজের জীবন বিপন্ন করে এক সৈনিক তাঁকে উদ্ধার করেছিল। সেই সৈনিককে তিনি চিনতেনও না..:

তারপর বক্তৃতা দিল কলিয়া লাম্বিক। তাতে আমরা খুব অবাক হলাম। ঠিক বোঝা গেল না কেন সে হঠাৎ বলতে শুরু করল কী করে তলিয়া ড্রেন পাইপ বেয়ে এক পাঁচতলা

বাড়িতে উঠেছিল। তারপর সে থেমে গেল। মনে হল যেন তার বক্তব্য বিষয়ের কথাটা মনে করার প্রাণপণ চেষ্টা করছে।

‘তাতে কী?’ একজন চেঁচিয়ে উঠল।

উত্তেজিত হয়ে কলিয়া বলল, ‘তাতে এই বোঝায়’—
শেচর্বাভ সাহসী, উপায় উদ্ভাবনে নিপুণ আর... আর
একেবারে তুখোড়!’

প্রত্যেকে হেসে উঠল। কিন্তু তাদের চুপ করাবার জন্য সভাপতি পেনসিল দিয়ে টেবিলে টোকা দিলেন।

‘শেচর্বাভ যা করেছে কোনো ভালো পাইয়োনায়ার তা করতে পারে না।’ খানিক থেমে আবার তিনি প্রশ্ন করলেন,
‘কোনো প্রস্তাব আছে?’

উত্তেজনায় সবাই টানটান হয়ে উঠল।

‘আমি কি বলতে পারি?’ ধরা গলায় বলল তলিয়া।

একসঙ্গে সবাই উঠল চেঁচিয়ে:

‘ঠিক কথা! ও বলুক! শেচর্বাভকে বক্তৃতা দিতে দেওয়া
হোক!’

তলিয়া উঠে দাঁড়িয়ে টেবিলের কাছে গিয়ে সোজা তাকাল
সামনে।

দৃঢ় স্বরে সে বলল, ‘সবকিছু আমি বদ্বোছি... কী ঘটতে
পারত ভাবতেই আমার ভয় করছে... আমার অনুরোধ...
আমার আন্তরিক অনুরোধ... আমাকে যেন তাড়িয়ে দেওয়া না

হয়। ওর চেয়ে খারাপ আমার পক্ষে আর কিছ্ হতে পারে না।
আমি পাইয়োনায়ার হতে চাই ... ভালো পাইয়োনায়ার হবই।’
তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়নি ...

‘সত্যিই কি তুমিই তলিয়া?’ ফটোটাকে আমি প্রশ্ন
করলাম। একটি মদুখের দিকে তাকিয়েছিলাম। খেলাধুলোর এক
পত্রিকার পাতা থেকে সে মদুখটি তাকিয়েছিল আমার দিকে।
তার সঙ্গে আমার ছেলেবেলার তলিয়ার কোনো সাদৃশ্য নেই।
শুধু হয়তো... চোখের শাদা পাতা আর ঠোঁটের কাছের দৃঢ়
রেখা ছাড়া। ক্যাপ্শন বলছে: ‘বিখ্যাত পাহাড়-চাঁড়িয়ে
আনাতলি স্বেচকিভ। নেপ্রিস্তুপ্নি চুড়োয় ওঠার সময় তিনি
মারা যান।’ সেজন্যই বিশ্বাস করতে চাচ্ছিলাম না যে এই আমার
পদুরোনো বন্ধু তলিয়া।

সম্পূর্ণ দৈবক্রমে পত্রিকাটা আমার হাতে এসেছিল। আমার
কামরায় যে লোকটি ছিলেন তিনি সেটা আমায় দেন। নিশ্চয়ই
তিনি খুব অবাক হয়েছিলেন যখন তাঁর আলাপী সহযাত্রীটি
পত্রিকাটি দেখার পর হঠাৎ চুপচাপ হয়ে কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর
না দিয়ে উপরের বাঞ্চে উঠে তার চামড়ার কোটটা নিজের কানের
উপর টেনে দিয়েছিল।

দুর্ভাগ্যক্রমে মস্কায় ফেরার পর নানা কাজে জড়িয়ে
পড়ি। ফলে কী ভাবে তার মৃত্যু হয় সে কথাটা জানতে
পারিনি।

সাভেলি সালাজঙ্কভের চিঠিটা পাবার পরই আমি যাই স্পিরিটনভকায় ক্ষীণ আশা নিয়ে যে হয়তো আনাতলির বাবা-মা তখনও সেখানে আছেন। কিন্তু তাঁরা ছিলেন না। তাঁদের ফ্ল্যাটে এখন যাঁরা থাকেন আমায় তাঁরা জানান যে যুদ্ধের গোড়ার দিকে শেচবাকভরা উজবেকিস্তানে গিয়ে সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। সেখানে তাঁরা কাজ পেয়েছেন নতুন এক কাপড়-মিলে। আনাতলি সম্বন্ধে আমি যা জানি সে কথাগুলোই তাঁরা আমাকে বলেন: পামিরে মারা যায়। নানা খেলাধুলো প্রতিষ্ঠানে ক্রমাগত খবর নেওয়ায় শেষ পর্যন্ত জানতে পারি দুই ভাই-এর মস্কোর ঠিকানা। তাঁরাও পাহাড়-চাড়িয়ে। আমাকে বলা হয়, “সব খবর তাঁরা জানবেন।”

অবিবাহিত লোকদের যে ঘরটিতে সেই ভাই দুজনে থাকতেন সেটার চেহারা পাহাড়-চাড়িয়েদের তাঁবু-বিহীন ছাউনির মতো। কোণে পড়ে রয়েছে রোদে রঙ-জ্বলে-যাওয়া ভারি ভারি রাকস্যাক, জানলার কাঁধে রয়েছে বরফের উপর ওঠবার কাঁটা লাগানো বড় বড় বুট আর মেঝেতে একটা প্রাইমাস স্টোভ বিরক্ত হয়ে গর্জন করছে, তার উপর চড়ানো বিরাট একটা তামার কেতলি। এই ভাই দুজনের মুখের আদলটা বিস্ময়কর হলেও তাঁদের প্রকৃতিটা একেবারে আলাদা। একজন হাত নাড়াতে নাড়াতে মেশিনগানের মতো তড়বড় করে কথা বলে, সবসময়ই তার মুখে হাসি। আরেক জন আলোচনার সময় সর্বক্ষণ খাড়া হয়ে গম্ভীর মুখে বসে রইল টেবিলের কাছে, তার বিরাট রোদে-পোড়া হাত

দুটো মূঠো করে রেখে। মনে হল বকবকে ভাই-এর দিকে তাকিয়ে তার চোখে যেন আতঙ্ক ফুটে উঠেছে।

‘য়েগর, কমরেডকে বলো ঘটনাটা কী ভাবে ঘটে,’ হড়বড় করে কথাগদুলো শোনা গেল। ‘কী আশ্চর্য, ভারি অদ্ভুত লোক তো! সব কথাই তুমি জানো, কিন্তু বলতে চাইছো না।’

‘বলতে চাইব না কেন?’ ভারি গলায় বলল য়েগর। ‘আমি বলতে অস্বীকার করিনি...’ আবার সে চুপ করে গেল।

তার ভাই তাড়া দিল তাকে, ‘আমাদের বলো শ্চেচর্বাঁকভ কী ভাবে মারা যায়।’

‘নেপ্রিস্তুপ্নি চুড়োয় ওঠার সময়,’ য়েগর বলল বাধের মতো।

‘সে কথা যে আমরা জানি তা কি জানো না? আরো বিশদ করে বলো...’

‘আপনি আর শ্চেচর্বাঁকভ কি একই দলে ছিলেন?’ আমি প্রশ্ন করলাম।

‘হ্যাঁ, মানে না — মানে প্রথমে ছিলাম, কিন্তু পরে দ্ব’দলে ভাগ হয়ে যাই।’

‘ভগবানের দোহাই, বলে যাও,’ ব্যস্ত হয়ে উঠল তার ভাই।

‘আমাদের দলকে সাহায্য করতে গিয়ে শ্চেচর্বাঁকভ মারা যায়...’

‘কী আশ্চর্য!’ তার ভাই নিজের উরুতে চাপড় মেরে আমার কোর্টের ল্যাপল ধরে টান দিল যেন আমার মনোযোগ আকর্ষণ

করার জন্য। তারপর আবার উত্তেজিত হয়ে য়েগরকে প্রশ্ন করল :

‘শেচবাকভ তাহলে তোমাদের উদ্ধার করছিল?’

‘হ্যাঁ,’ সহজ স্দুরে বলল য়েগর।

‘কী আশ্চর্য! আমার ভাইটা অদ্ভুত! এটাই ওর বিশেষত্ব।’
আমার দিকে সে তাকাল। ‘এই প্রথম কথাটা শুনলাম! আর মনে রাখবেন, পাহাড়েও ও ঠিক এই রকমই। নিজের ছায়া আপনার যে রকম সঙ্গী, সঙ্গী হিসেবে ও ঠিক তাই— বিপদ সম্বন্ধে সাবধান করা ছাড়া কখনো ও মূখ খোলে না।’

বহু কণ্টে টুকরো টুকরো কথাগুলো যোগ করে পুরো গল্পটা খাড়া করলাম ... বরফ-ঢাকা চুড়োটাকে চরম আক্রমণ করার জন্য পাহাড়-চাঁড়িয়েরা দূ’দলে বিভক্ত হয়। য়েগর ছিল একটি দলের নেতা। তার দলে ছিল তিন জন। অন্য দলের নেতা ছিল আনাতলি শেচবাকভ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দুটি দল খাড়া পাহাড়টার বরফ-ঢাকা গা দিয়ে এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে উঠছিল, এমন সময় য়েগরের দলের ঘণ্টে বিপদ। তাদের পথে বড় একটা বরফের চাঁই ভেঙে পড়ে। আর একটু হলেই তাদের নিয়ে নীচে পড়ত। ফলে তারা একটা সরু বরফের স্তরের উপর এসে পড়ে। সেখানে ভালো করে দাঁড়াবার জায়গাও নেই। তারা মৃত্যু শীতল বরফের দেওয়াল ধরে অপেক্ষা করতে থাকে।

তাদের নীচে গাড় নীল রঙের একটা অতলস্পর্শ গহবর। সেখানে ছিল শূন্য একটি তরঙ্গায়িত চলন্ত মেঘ ...

চুড়োয় প্রথম ওঠে আনাতলি শেচবার্কাভ। সঙ্গে সঙ্গে সে য়েগরের দলকে দেখতে পায় আর বুদ্ধিতে পারে তাদের অবস্থাটা। নিজের দড়িটা খানিকটা খুলে সে বাঁধে একটা বরফের চাঁই-এর সঙ্গে। ইতিমধ্যে য়েগরের দলের লোকেরাও তাকে দেখতে পায়। ছোটো গিঁট বেঁধে আনাতলি বার কয়েক দড়িটাকে জোরে হ্যাঁচকা টান দেয়। দড়িটা খোলে না। তখন সে দড়িটা নিজের কোমরে বেঁধে বরফের দেওয়ালে পা দিয়ে নীচে নামতে শুবু করে যেখানে য়েগরের দলের লোকেরা ছিল। সে যখন নামছে তখন মনে হয় বরফের চাঁইটা যেন দুলে উঠল ... পরের মুহূর্তে সেটা খসে যায়। বরফের চাঁই আর আনাতলির দেহটা সেই স্তরের উপরকার মানুষদের পাশ দিয়ে সবেগে নীচে পড়ে যায় গুমগুম শব্দ করতে করতে ... বেশ খানিক পরে আনাতলির সঙ্গীরা খাড়া পাহাড়টার উপরে চড়ে আর শেষ পর্যন্ত উদ্ধার করে য়েগরের দলকে ...

বাড়ি ফিরে এই মর্মান্তিক গল্পটা বহুক্ষণ ভাবি আর ভাবি আনাতলির কথা। ফ্রণ্টে এক তরুণ সৈনিকের সঙ্গে একবার আমার যা কথা হয়েছিল হঠাৎ সেটা মনে পড়ে যায়। সেই সৈনিক তিনটে নাজি ট্যাঙ্কের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হয়েছিল। সৈনিকটির পাবার কথা ছিল “হিরো অফ দি সোভিয়েত ইউনিয়ন” খেতাব। আমি এমন একটি গল্প লিখতে চেয়েছিলাম যাতে প্রত্যেকে বুদ্ধিতে পারে তার অসাধারণ সাহসের সবটা। তাকে নানা প্রশ্ন করে জানতে চাই ট্যাঙ্কগুলো যখন সোজা

তার দিকে আসছিল তখনকার তার মনোভাবের কথাটা। ছেলোট চুপ করে থাকে, ভাবতে চেষ্টা করায় কুঁচকে ওঠে তার কপালটা। তারপর হো-হো করে হেসে ওঠে।

‘কী ব্যাপার?’ আমি জানতে চাই।

সে হেসে চলে। আমি অপেক্ষা করে থাকি।

তখনও হাসতে হাসতে সে বলে, ‘এমন কিছু দরকারী কথা নয়। আমার মনে পড়ে গ্রামে একবার অন্য ছেলেদের সঙ্গে শিকার তাড়াবার লোক হিসেবে নেকড়ে শিকারে যাবার কথাটা। কিন্তু নেকড়েটাকে দেখতে পেয়ে আমরা ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুট দিই। ফলে শিকারটা ফসকায়। তার জন্য পরে যৌথখামারের এক সভায় আমাদের খুব বকুনি খেতে হয়েছিল ...’

আমি যখন লিখতে শুরুর করি আমায় থামাবার জন্য সে হাত বাড়ায়।

‘এ সব কথা আপনি লিখছেন কেন? এর তো কোনো মানে হয় না!..’

কিন্তু এ থেকে আবার প্রমাণ হয় যে ছেলেবেলাই হচ্ছে লোকের জীবনযাত্রার আরম্ভ।

আনাতলি শেচবাকভের যৌবনের কোনো কথা আমি জানি না। জানি না সেই বরফ-ঢাকা খাড়া পাহাড়ে যখন তার জীবনের শেষ মূহূর্ত কটি নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছিল তখন কী কথা সে ভেবেছিল? কিন্তু আমাদের সদুদ্দর ছেলেবেলার কথা ভাবতে গিয়ে দেখতে পাচ্ছি আমাদের মস্কোর উঠনটা যেন সেই উঁচু

বরফের চুড়োওলা পাহাড়টার পাদদেশ, যেটার উঠছিল
আনাতলি। কে জানে সেই বরফ-ঢাকা খাড়া পাহাড়টায় ওঠার
সময় ক্ষণিকের জন্য তার মনে পড়েছিল কি না অতীতের সেই
নড়বড়ে ড্রেন পাইপটার কথা?! কিম্বা নদী তীরের সেই
দুর্ঘটনাটার কথা যখন সে ছুটে গিয়েছিল তার কমরেডকে
উদ্ধার করার জন্য?!

পাঠকদের প্রতি

বইটির অনুবাদ, বিষয়বস্তু ও অঙ্গসজ্জার
বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয়
বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে
গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:

বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়

২১, জুবোভ্‌স্কি বুলভার

মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Foreign Languages Publishing House
21, Zubovsky Boulevard
Moscow, Soviet Union

ইস্কুল মাষ্টারের সন্তান ভাসিলি
আদামাৎস্কির জন্ম স্মলেনস্কের কাছে
১৯১১ সালে। একত্রিশ বছর বয়সে
তার প্রথম গল্পের বই প্রকাশিত
হয়। তিনি জনপ্রিয় সোভিয়েত গল্প-
লেখকদের অন্যতম।

বর্তমান গল্পসংগ্রহের মধ্যে
লেখকের শ্রেষ্ঠ গল্পগুলি স্থান
পেয়েছে।

